কুমারীকন্যা কাহিনী

কুমারীকন্যা কাহিনী

শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

বিহার সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড
৩৭এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

শ্রীমতী রেনুকণা দেবী

সুচরিতাসু—

সূচীপত্র

এই বইয়ের নামকরণ করেছেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুসাহিত্যিক

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

।। স্বয়ংসিদ্ধা ।।

বাইরে সূর্যের রশ্মি প্রায় স্তিমিত হয়ে এল। শ্রীকণ্ঠদেবের মন্দির-ভিতরে ঘৃতপ্রদীপের আলো জ্বালালেন ঋষি ঋতধ্বজ।

মূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে আছে দুঃখিতা চিত্রাঙ্গদা। তাঁকে লক্ষ্য করে গভীর কণ্ঠে বললেন ঋষি, 'বাইরের আলো সংহরণ করে এমনি করেই অন্তরে আলো জ্বালাতে হয় মা! পিতাকে লঙ্ঘন করে স্বয়ংসিদ্ধা হয়েছ তুমি। কি পেলে তার ফলে ?—দুঃখ। স্বয়ংসিদ্ধা হওয়া কি সহজ? তার জন্য চাই হৃদয়ের তপস্যা। যদি পার, অন্তরের আলো চয়ন কর, সত্যিকারের স্বয়ংসিদ্ধা হও।'

স্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইল গন্ধর্বনন্দিনী চিত্রাঙ্গদা। ধীরে মন্দির ত্যাগ করে বাইরে এসে দাঁড়ালেন তপোধন-ঋষি।

নির্জন অরণ্যে সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসছে। গোধূলির রাঙা আলোয় রাঙা বনতল। অমনি বেদনা-রাঙা ঋষির হৃদয়। দুঃখিনী চিত্রাঙ্গদার দুঃখ যেন শেলের মত বাজছে অন্তরে।

পরম শৈব পাশুপতাচার্য ঋতধ্বজ। শিবময় শঙ্করের উপাসক তিনি। তাঁর জীবনব্রত জগতের কল্যাণ। মানুষের দুঃখমোচন করাই তাঁর ধর্মের লক্ষ্য।

করুণায় সজল হয়ে ওঠে তাঁর নয়ন, বেদনায় রাঙা হয়ে ওঠে

পুরবাসী নয়—বনের প্রকৃতি। প্রাণভরে প্রকৃতি বুঝি দেখত, প্রকৃতির বুকে প্রকৃতিবালার প্রাণের লীলা। হয়তো দেখতে দেখতে উদাসীন হয়ে যেত সে, হয়তো তার মনে জাগত করুণ এক হতাশা। অনাদিনিত্যা মায়া-প্রকৃতি,—তার কাজ পুরুষকে মুগ্ধ করা, বদ্ধ করা। মোহিনীর কলা-কৌশলে পুরুষকে বদ্ধ করতে পারল না যে প্রকৃতি, —কিসের তার রূপের গৌরব, গুণের প্রশংসা ?

মোহিনী প্রকৃতির এই নীরব হতাশা একদিন যেন আশানুরূপ মূর্তি ধরে প্রকট হল কুমারী রাজনন্দিনী চিত্রাঙ্গদার বিহারস্থলীতে।

সখীসঙ্গে সেদিন চিত্রঙ্গদা এসেছিল জলবিহারে। অসম্বৃতবসনা অঙ্গনাদের অঙ্গস্পর্শে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল নৈমিষবনের কাঞ্চনাক্ষী নদীর জল। জলে নিমগ্ন আকণ্ঠ বপু, ওপরে ভাসমান প্রমুক্ত আনন, যেন তরঙ্গে তরঙ্গে প্রস্ফুটিত সহস্র কমল। জলক্রীড়ায় উদ্দাম চঞ্চলা ললনা—আরও উদ্দাম, আরও চঞ্চল নদীর ঢেউ। কলমুখর তরুণী, কলমুখর তরঙ্গিণী। বর্ণহীন, গন্ধহীন জল—বর্ণে বর্ণময়, গন্ধে গন্ধোন্মাদ।

সহসা কলধ্বনি নীরব হয়ে গেল, যেন যাদুমন্ত্রে স্তব্ধ হল বীণাতন্ত্র। এক হস্তে স্খলিতপ্রায় কঞ্চুলি, অপর হস্তে শিথিল কাঞ্চী ধারণ করে—সন্ত্রস্তে স্থির হয়ে দাঁড়াল অঙ্গনাদল।

তরঙ্গিণী-তীরে চিত্রার্পিত মদনের মত নিষ্পলক দাঁড়িয়ে আছে মকরচূড়মুকুটধারী এক সুবেশ কুমার।

'কে ইনি ?'—নির্বাক প্রশ্ন জাগল কুমারী চিত্রাঙ্গদার মনে। সুধীর, অচপল সেই চিত্রাঙ্গদা, পুরুষের সকাম দৃষ্টিশরে যে আহত হয়নি কোনদিন।

হেসে বলে উঠল সখী অনঙ্গমঞ্জরী, 'সখি, উনি বিদর্ভরাজ সুদেব-তনয় কুমার সুরথ।'

'রাজকুমার সুরথ!'—আপনমনেই কথাগুলি উচ্চারণ করল রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদা। শুদ্ধগুণসম্পন্ন সুরথ, যৌবনে সংযমী সুদেব-তনয় সুরথ!

অন্য কেউ হলে হয়তো রাজকুমারীর স্থির গাম্ভীর্যে ঘনতর ছায়া নামত, হয়তো কঠিন হত দৃষ্টিশর। কিন্তু আজ এ কি পরিবর্তন! বিভোলা রাজনন্দিনী।

সহসা আরক্ত হয়ে উঠল তার কপোল। রক্ত কপোলের আভায় রাঙা হয়ে উঠল সিক্তকুন্তলঝরা শীকরকণা। কোন এক অদৃশ্য তনুহীন দেবতার অহেতুক পীড়নে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইল সে।

চোখে চোখ পড়তেই—চোখ' ফিরিয়ে নিল লজ্জিত, মোহিত রাজকুমার। মকরচূড় মুকুটের চূড়াখানি যেন সলজ্জে দোল খেল, সলজ্জে ত্বরিতে আত্মগোপন করল নদীতীরের আড়ালকুঞ্জে। দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল একটি ভীরু, মদনাতুর দৃষ্টি।

সেদিনের মত জলখেলা ভেঙে গেল। মনখানি নদীতীরে রেখে স্বেদসিক্ত তনু নিয়ে মন্থর গতিতে প্রাসাদে ফিরে এল তন্বঙ্গী চিত্রাঙ্গদা। কুমারী চিত্রাঙ্গদা—কৌমারহর যৌবনের চাঞ্চল্যে যে চঞ্চল হয়নি কোনদিন।

সেদিন রাজকুমারীর মধ্যাহ্নশয়নে স্বপ্নাতুর নয়নে চকিতে জেগে জেগে উঠল একটি মূর্তি—মাথায় যার মকরচূড় মুকুট, চোখে যার ভীরু, সলজ্জ এক তৃষাতুর দৃষ্টি। এ দৃষ্টিশরকে চিত্রাঙ্গদা উপেক্ষা করেছে বহুদিন। কিন্তু আজ? আজ কি দর্পক এল সদর্পে, দর্প-হারীর বেশে?

অজানা সুখ, অজানা আতঙ্ক। পুলকাঞ্চিত তনু, কিন্তু অশ্রুতে পরিপূরিত নয়ন। বা'র বার শিউরে ওঠে কুমারী চিত্রাঙ্গদা। কিসের এই সুখ? কিসের এই শিহরণ?

রাত্রি এল দুঃসহ অস্থিরতা নিয়ে। নৃত্যপ্রিয়া, গীতপ্রিয়া, পরিহাস-প্রিয়া চিত্রাঙ্গদার কাছে নৃত্য, গীত, পরিহাস অর্থহীন বলে মনে হল। স্বর্ণপালঙ্কের স্বর্ণরেখায় মণিদীপের মধুর আলো চিত্রাঙ্গদার চোখে স্বপ্নমায়ার সৃষ্টি করল। নয়নে ভেসে ভেসে উঠল, সেই অপূর্ব তনুশ্রী, সেই অপ্রতিম রূপ।

কোন এ নতুন জীবনে যেন নবজন্ম হয়েছে কুমারী চিত্রাঙ্গদার। চূর্ণ লৌহে এক কোন্ পরশমণির পরশ! চুম্বকশক্তি যেন সে মণির স্পর্শে। সবলে আকর্ষণ করছে চিত্রাঙ্গদাকে।

পরদিন প্রভাতকালেই জলবিহারের জন্য উতলা হল চিত্রাঙ্গদা। নিজে থেকে ডেকে পাঠাল সৈরিন্ধ্রীকে। আমলকী, হরিদ্রা, কুঙ্কুম—দিব্য উদ্বর্তন দ্রব্যে অঙ্গ অধিবাসিত করে, সখীসঙ্গে চিত্রাঙ্গদা চলল কাঞ্চনাক্ষী নদীর দিকে।

আজ রাজকন্যা সকলের পুরোভাগে—যেন পুণ্যলোভী স্নানার্থিনী চিত্রাঙ্গদা। নতুন তীর্থনীরে অবগাহন করতে চলেছে ব্রতচারিণী পুণ্যবতী।

শঙ্কিতা হল সখীদল। রাজকুমারীর এ আচরণ অস্বাভাবিক। যেমন অস্বাভাবিক, তেমনই আকস্মিক। আর এ আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ অজানা নয়! যৌবন-নিকুঞ্জে এমনই পরিবর্তন আসে অলক্ষ্য এক সুন্দর দেবতার আবির্ভাবে। মানুষ তাকে দেখে না, কিন্তু অঙ্গে অঙ্গে অনুভব করে সে অনঙ্গ দেবতার সঞ্চরণ। মূককে মুখর, ধীরকে অধীর করে তোলেন সে দেবতা।

জলবিহার আরম্ভ হল। চঞ্চলা আজ অচপলা। রুদ্ধ যৌবন চাপল্যে উদ্দাম। জলাঞ্জলি, হুড়াহুড়ি। পদ্মরেণু আর হলুদচূর্ণে চূর্ণ সোনার বরণ ধারণ করল তটিনী-নীর। তরঙ্গ অস্থির হয়ে উঠল তরুণীর প্রগল্ভতায়। কামিনীর কলকলা শব্দে কলমুখর কল্লোলিনী।

জলকেলি করছেন গন্ধর্বরাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা। তার দেহে আজ নটিনীর নাট, নয়নে স্বরপ্সরীর আবেশ। খঞ্জন যেন নয়ন, ভ্রূযুগ যেন গুণবর্জিত ধনু।

'ওই যে সেই রাজকুমার'—শঙ্কাভরে বলে উঠল অনঙ্গমঞ্জরী। আজ হাসি নয়, আতঙ্কে আকুল সখীদল।

অদূরে তৃষাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নবীন মদন, আর তার দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে দ্বিতীয়া রতি চিত্রাঙ্গদা। গন্ধর্বরমণীর

আবেশ তার নয়নে। নৈমিষারণ্যে নিমেষহীন হয়েছে নয়ন। খেয়াল নেই সিক্তবসনে সূক্ষ্ম দুকূল অঙ্গের সম্ভ্রম রক্ষা করছে কি না, খেয়াল নেই বিশ্বকর্মানন্দিনী নিজের কুলমর্যাদা হারিয়ে ফেলছে কি না। আপনহারা আবেশ, নিখিলহারা সম্বিৎ। স্তব্ধ উন্মত্তা তরঙ্গিণী।

সাবধান করে দিল সখীর দল।

'তোমার সিক্ত দুকূল অংসস্খলিত হয়েছে সখি।'

'উদ্দাম জলখেলায় তোমার কাঁচুলি-বন্ধন শিথিল হয়েছে।'

'সখি, লম্পট পবন তোমার কাঞ্চীহরণে উদ্যত।'

রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদা সিক্ত বসনেই অঙ্গ আবৃত করল, সূক্ষ্ম সিক্ত দুকূল অংসে স্থাপন করল। শিথিল কাঞ্চী এক হস্তে ধারণ করে গম্ভীর স্বরে বলল 'কূলের ওই রূপই কি দুকূল হারাবার মত নয় সখি?'

'কূলের রূপে কুলমর্যাদাকে ভোলা উচিত নয় রাজকন্যা। মনে রেখ, কুমারী তুমি—পিতার অধীন।'

ধীর গাম্ভীর্যে উত্তর করল চিত্রাঙ্গদা, 'অধীন হলেও আমি স্বাধীন।'

সঙ্কল্পে কঠিন হয়ে ওঠে চিত্রাঙ্গদা, কিন্তু পরমুহূর্তেই কেমন যেন বিহ্বলতা। অশ্রুসজল কণ্ঠে সে বলে, 'চেয়ে দেখ, ওই অনঙ্গমোহন রূপ, চেয়ে দেখ, ওই সুগভীর নীল নয়ন, আর দেখ ওই স্মরাতুর নয়নের সকাতর ম্লানিমা। জগতে কে এমন কন্যা আছে, সুন্দরের এই কাতরতা দেখে যে কৃপাবতী না হয়?'

সন্ত্রস্তে উত্তর করল শঙ্কিতা সখীদল, 'কৃপাবতী হও দোষ নেই, কিন্তু অহেতুক কৃপার বশ হয়ো না। তুমি অপ্রগল্‌ভা, আজন্ম আত্মসংযমে তোমার দীক্ষা। অসংযম তোমার পক্ষে অশোভন।'

'যে তনুতে অতনুর অধিষ্ঠান, সে তনুতে কোথায় সংযম? প্রগল্‌ভ দেবতার আবির্ভাবে, কে অপ্রগল্‌ভ থাকে সখী?'—কম্পিত কণ্ঠে বলে চিত্রাঙ্গদা।

ধীর স্বরে বলল সখী ধর্মধীরা, 'তুমি বালা, পিতার অধীনা।

আত্মদানে তোমার স্বতন্ত্রতা নেই। পিতার অনুমতি না নিয়ে কিছুতেই তুমি অনঙ্গায়ত্ত হতে পার না।'

বাধায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল গন্ধর্বকন্যা। স্থির কঠিন কণ্ঠে সে বলল, 'সখি, অনঙ্গ কি নিয়মের অধীন? গন্ধর্বকুলে আমার জন্ম—গান্ধর্ব মিলন আমাদের কুলধর্ম। হৃদয়ধর্ম আর কুলধর্ম কোনটিই লঙ্ঘন করা আমার উচিত নয়, আমার উচিত ওই সুন্দরকে কৃতকৃতার্থ করা।'

ধীরে জল থেকে উঠল অনঙ্গাধীনা চিত্রাঙ্গদা, যেন সাগরজল থেকে উঠে এল সিক্তবসনা সাগরিকা। জল যেন স্বেচ্ছায় দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পথ ছেড়ে দিল। প্রমুক্ত, প্রোদ্দাম আজানুলম্বিত কেশদাম,—কেশবিমুক্ত মুক্তার মত জলধারা। যেন করিণী আজ পীযূষধারা সিঞ্চন করছে কমলচরণা কমলার পাদপদ্মে। সিক্তবসনে অনাবৃত অঙ্গলাবণ্য, যেন শুভ্র অভ্রাবরণে পূর্ণিমার ঢল ঢল কৌমুদী।

তটিনী-তটে জলরেখায় চরণচিহ্ন অঙ্কিত করে এগিয়ে চলল চিত্রাঙ্গদা। পদক্ষেপে কম্পিত হল কুণ্ডল, কাঁচুলি, চন্দ্রহার।

পশ্চাতে ব্যগ্রকণ্ঠে আবার বাধা দিল সখীবৃন্দ, 'যেও না, রাজকন্যা, যেও না।'

হেসে বলল শুচিস্মিতা, 'আমায় বাধা দিও না।'

কঠিন কণ্ঠে বলল ধর্মধীরা, 'পিতার বর্তমানে স্বয়ংসিদ্ধা হওয়া অনুচিত।'

'চিরকাল স্বয়ংসিদ্ধ গন্ধর্বকুল। সেই কুলধর্মে স্বয়ংসিদ্ধা হবে চিত্রাঙ্গদা।'

বৃথাই পশ্চাতে উচ্চারিত হল সখীদলের বারণ-ধ্বনি। মদমত্তা বারণীর মত, পর্বকালে উচ্ছ্বসিতা তরঙ্গিণীর মত অমন্দগতিতে অগ্রসর হল চিত্রাঙ্গদা। নতুন রাগাঞ্জনে অরুণ হয়ে উঠেছে যেন নৈমিষবন। অকালে যেন মঞ্জরিত হয়েছে রক্তাশোকের গুচ্ছ, রক্তপাটলের রক্তরাগে আরক্ত বনতল। শাখী-শাখে বন-পারাবতের কূজন-কাকলি, তৃণতল্পে বনহরিণীর দেহকণ্ডুয়ন, কুসুমকেশরে প্রমত্ত মধুপগুঞ্জন। প্রমত্তা

চিত্রাঙ্গদা,—অদৃশ্য কোন সাক্ষীপুরুষের সান্নিধ্যে যেন জাগ্রত, ক্রিয়াচঞ্চল প্রসুপ্তা প্রকৃতি।

'রাজকুমার সুরথ!'

বিদর্ভরাজনন্দন সুদেব-তনয় সুধীর সুরথ। সত্ত্বসম্পন্ন, বিশুদ্ধ তার স্বভাব। স্বর্গের স্বপ্ন তার নয়নে। স্বপ্নই দেখছিল সে—নন্দনবনে সুরাঙ্গনার সুখস্বপ্ন। কে বেশি সুন্দর? ওই অম্লান পারিজাত, না এই অমলিন গন্ধর্বকন্যা? নীল কেশকলাপে সুশুভ্র আনন যেন সুনীল আকাশে স্থির চন্দ্রলেখা। লাবণ্যতরঙ্গে উদ্বেল রূপসাগর।

সহসা কর্ণে প্রবেশ করল গন্ধর্বনিন্দিত কণ্ঠস্বর, 'রাজকুমার!'

কিম্পুরুষবর্ষে উন্মুক্ত হল কি সিদ্ধাঙ্গনার মধুকণ্ঠ! স্বপ্নলোক থেকে জাগ্রত স্বপ্নলোকে ফিরে এল বিদর্ভরাজকুমার সুরথ। স্বপ্নের মানসী মূর্তিমতী হয়ে দাঁড়িয়েছে তারই সম্মুখে। মূর্তি ধরেছে যেন স্বর্গের ছন্দ, স্বর্গের মূর্ছনা, স্বর্গের গান।

ভাষা হারিয়ে ফেলেছে মুগ্ধ, হতচকিত, কন্দর্পাহত কুমার। বুকের অতলে উত্তাল ভাষাতরঙ্গ, অধরপ্রান্তে নিশ্চুপ বৈখরী। কেবল অরবছন্দে কাঁপছে অধরতন্ত্রী।

'কথা বল রাজকুমার।'

কি কথা বলবে সুরথ? কথা কি কোনদিন পেরেছে মর্মের সবচেয়ে অকথিত বাণীকে রূপ দিতে? পেরেছে কি সবচেয়ে বড় আবেগের ভাষাটিকে প্রমূর্ত করতে? সকল মুখরতাকে মূক করে দেয় প্রাপ্তির চরম মুহূর্ত—সাগরসঙ্গমে কলস্তব্ধ কল্লোলিনী।

তবুও গদগদ স্বরে বলে স্মরমূর্ছনায় অভিভূত সুরথ।

'রাজকুমারী!

'বল রাজকুমার!'

'জানি, অতি কঠিন তোমার কুমারীব্রত—'

'ভয় পেয়ো না, বল! জেনো, অতি কোমল কুমারীর মন।'

'জানি, অনিন্দনীয় তোমার কুলগৌরব—'

'বল, বল রাজকুমার! আমি গন্ধর্বকন্যা, গান্ধর্ব ধর্মে প্রতিষ্ঠিত গন্ধর্বকুল।'

'তবুও পিতার অধীন তুমি—অস্বতন্ত্র, পরবশ। আর আমি—'

ধৈর্যের বাঁধ যেন ভেঙে যেতে চায়। আকুল স্বরে বলে চিত্রাঙ্গদা, 'আর তুমি,—তুমি কি?'

এক নিঃশ্বাসে ঝড়ের বেগে বলে সুরথ, 'কুমারীধর্মে ব্রতচারিণী যে রাজকন্যা, কুলের গৌরবে গরবিনী যে নন্দিনী, পিতার অধীনা পরবশ যে দুহিতা—আমি তারই দৃষ্টিশরে আহত, নির্জিত। ওগো মদিরেক্ষণে, তুমি দর্শনমাত্র হৃদয় হরণ করেছ আমার। আমায় তুমি রক্ষা কর।'

কেঁপে ওঠে স্মরাহত সুরথের কণ্ঠ, অদ্ভুত চাঞ্চল্যে কেঁপে ওঠে রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদা। সমীরণে কম্পিত অশোকমঞ্জরী, চন্দনবনে কম্পিত চন্দনা। এমন মধুর প্রণয়-ভাষণে, সুন্দরের এমন আত্ম-নিবেদনে—কোন নারী কোনদিন নিজেকে পারেনি সংবরণ করতে, বিশেষত সেই নারী, করুণায় কোমল যার চিত্ত, প্রেমে বিগলিত যার অন্তর।

পিতার বশ নয়, স্ববশও নয়,—অবশ চিত্রাঙ্গদা। সমস্ত সম্বিৎ যেন হারিয়ে ফেলেছে সে, হারিয়ে ফেলেছে লজ্জা, ভয়। অন্তর থেকে উঠছে আত্মার ক্রন্দন, সে ক্রন্দনে আত্মহারা কুমারীকন্যা। আত্মদানে উন্মুখ, উতলা রাজনন্দিনী।

বৃথাই ভেসে আসে সখীদের নিষেধবাণী, 'কুমারী তুমি পিত্রধীনা—স্বয়ংসিদ্ধা হওয়া তোমার অনুচিত।' বসন্তের হৃৎপ্রকাশিনী মধুর রাগিণীতে ভেসে যায় সকল সুর, সকল স্বর। নদীতে জেগেছে সিদ্ধির আনন্দ, পলাশের ডালে, রক্তাশোকের গুচ্ছে সিদ্ধির রাগ, সিদ্ধাঙ্গনা গান ধরেছে সপ্তপর্ণী বৃক্ষের ছায়ায়। স্বয়ংসিদ্ধ কে নয়? চিত্রাঙ্গদাও স্বয়ংসিদ্ধা হবে, স্বয়ং সিদ্ধি লাভ করবে সে আত্মদানে।

রাজকুমার সুরথের বলিষ্ঠ বাহুর নিবিড় আশ্লেষে মুদিতা পদ্মিনী চিত্রাঙ্গদা। স্বয়ংসিদ্ধা অনূঢ়া রাজকন্যা—গোপন তার স্বয়ংবর, গোপন তার আত্মদান। মনকে সান্ত্বনা দেয় সে—গান্ধর্ববিবাহ গন্ধর্বকুলের

কুলধর্ম। কুলধর্ম যদি সত্য হয়, সার্থক হবে স্বয়ংসিদ্ধা চিত্রাঙ্গদার আত্মদান চিত্রাঙ্গদা কুলধর্ম লঙ্ঘন করেনি, লঙ্ঘন করেনি হৃদয়ের ধর্মকে।

সহসা অকালে বসন্তকালে কালবৈশাখীর উদয় হল। নিরভ্র নির্মল অম্বরে ভীষণ মেঘাড়ম্বর। কালো ছায়ার বিভীষিকা ছড়িয়ে পড়ল আলোভরা নৈমিষ অরণ্যে, ম্লান হয়ে গেল অশোকগুচ্ছ, রক্তপাটল—নদীজলে কলহংসের কলগুঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেল। মেঘডম্বরে গর্জন করে উঠলেন গন্ধর্বরাজ অমিতপ্রভ বিশ্বকর্মা, 'চিত্রাঙ্গদা।'

কঠিন বাগ্‌বজ্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল—একবৃন্তলীন দুটি কোমল কুসুম। বেপথুমান কুমার সুরথ, বেপথুমতী কুমারী চিত্রাঙ্গদা—সহসা বিপথে পড়েছে যেন অসহায় দুটি কোমল প্রাণ।

গর্জন করে উঠলেন বিশ্বকর্মা, 'পিতার অধীন কুমারী কন্যা। পিতাকে লঙ্ঘন করে স্বেচ্ছায় স্বয়ংসিদ্ধা হয়েছ। রে মদচেতসে, বালসুলভ চাপল্যে ধর্মকে পরিত্যাগ করেছ তুমি, আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি, অবিলম্বে তুমি দয়িত থেকে বিয়োজিত হও। বিবাহ, স্বামী-সঙ্গ, সন্তানসুখ থেকে বঞ্চিত হও তুমি, হে প্রগল্‌ভে।'

কন্যাকে এই কথা বলে কুমার সুরথের দিকে ফিরলেন তিনি। বজ্রগম্ভীর স্বরে বললেন গন্ধর্বরাজ, 'হে সুদেবনন্দন, দুর্মতি বশে অগ্নিশিখাকে স্পর্শ করেছ তুমি—তোমাকেও এর সমুচিত ফল ভোগ করতে হবে।'

ক্রোধে আরক্তমুখে প্রস্থান করলেন বিশ্বকর্মা। নিমেষে নৈমিষবনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল কাঞ্চনাক্ষী নদীর জল। সপ্তসরস্বতীর একটি প্রবল ঢেউ মুহূর্তে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল অকৃতার্থ নৃপতি-নন্দন কুমার সুরথকে।

বিপর্যয়ে আশাভঙ্গে কম্পিতা চিত্রাঙ্গদা। নিদারুণ মোহে আচ্ছন্ন হয়ে লুটিয়ে পড়ল বনতলে। সখীরা হাহাকার করে উঠল। সরস্বতীর শীতল সলিল সিঞ্চনেও সংজ্ঞা ফিরে এল না। সখীরা প্রমাদ গণল। অল্পমতি অঙ্গনার মত তারা সিদ্ধান্ত করে বসল, তাদের

সখী গতাসু হয়েছে। সন্ত্রস্ত ক্রন্দন, সত্বর ছুটাছুটি। কেউ অগ্নি-চয়নোদ্দেশে বনের মধ্যে চলে গেল, কেউ ছুটল রাজপুরীর দিকে। নদীপুলিনে একাকী পরিত্যক্তা হল চিত্রাঙ্গদা।

শীতল শীকর-বাহিত সমীরণে অচিরেই সংজ্ঞা ফিরে এল তার। চোখ মেলে তাকাল চিত্রাঙ্গদা। মোহাচ্ছন্ন চেতনায় নিরাশার ক্রন্দন। কোথায় তার প্রিয়তম সুরথ, কোথায় প্রিয় সঙ্গিনীদল? নির্জন অরণ্যে সে একা।

বুক ভেদ করে জাগে অশ্রুর উচ্ছ্বাস। মনে পড়ে পিতার ভ্রূকুটিকুটিল অভিশাপ। আকুল হয়ে ওঠে চিত্রাঙ্গদা। কি কাজ প্রিয়বিরহিত জীবনে, কি কাজ এই অভিশপ্ত দেহে?

ধীরে উঠে দাঁড়াল অভিশপ্তা স্বয়ংসিদ্ধা। ধীর পদক্ষেপে বন-প্রান্তের দেবদারুশ্রেণী অতিক্রম করে এসে দাঁড়াল সপ্তসরস্বতার কাঞ্চনাক্ষী স্বর্ণধারার তীরে।

জলে অপরাহ্নের সোনার কিরণ—শুভ্র ফেনায় চূর্ণ স্বর্ণরশ্মি সজল, ছলছল। কোন্ বেদনার রঙ মুখে মেখে যেন রক্তমুখী হয়ে উঠেছে সজল শুভ্র ফেনা। অমনি বেদনার রঙ মদন-তপ্ত চিত্রাঙ্গদার মনে। তপ্ত উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত অশ্রু অজস্র ধারায় নয়ন, গণ্ড, বক্ষ প্লাবিত করে। স্থির সঙ্কল্পে সরস্বতীর জলে নিজেকে বিসর্জন দেয় দুঃখিতা চিত্রাঙ্গদা।

প্রবল স্রোত, উত্তাল তরঙ্গ। কাঞ্চনাক্ষীর সুতীব্র স্রোতে ভেসে চলল চিত্রাঙ্গদা। বিলুপ্ত চেতনা, নিমীলিত কমল-নয়ন। জানতেও পারল না সে, কোথায় চলেছে, কেন চলেছে? কাঞ্চনাক্ষী ছাড়িয়ে বেগবতী গোমতী, গোমতী ছাড়িয়ে কাজলনীল কালিন্দী। কালিন্দীর একটি তরঙ্গ চিত্রাঙ্গদাকে এক মহাবনে নিক্ষেপ করে দিয়ে গেল। তার মূর্ছিত চেতনায় কোন সাড়া জাগল না। সে জানল না,—তখন গভীর রাত, গভীর রাতে জীবের দুঃখে জাগে অনির্বাণ নক্ষত্রজ্যোতিঃ। অন্ধকারে ভবিতব্যতার সাক্ষী হয়ে ওরা জেগে থাকে।

রাত কেটে গেল। প্রভাতের মৃদুমন্দ সমীরণে নয়ন মেলে তাকাল ঈষৎ-চেতন চিত্রাঙ্গদা। চৈতন্যের ক্রমস্ফুরণে যেমন ক্রমে ক্রমে চিদাত্মায় অহংজ্ঞান জাগে, তেমনই অহংবোধের জাগরণ। একে একে মনে পড়ছে পূর্ব ঘটনা। দুঃখে ভেঙে পড়ছে চিত্রাঙ্গদা। কেন মরল না সে? মরতেই তো চেয়েছিল। হতাশ্বাস, আশাভঙ্গ, সুতীব্র আঘাত কাকে মরণে প্ররোচিত না করে?

এমন সময় গভীর অরণ্যে জাগল সুগম্ভীর এক কণ্ঠ। সচকিত হয়ে দেখল চিত্রাঙ্গদা, তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে এক গুহ্যক।

গগনবিহারী গুহ্যক—ত্রিদিবের গূঢ়, গুহ্য ঘটনা তাঁদের নখদর্পণে। গম্ভীরকণ্ঠে তিনি বললেন, 'জীবন কেন বিসর্জন দেবে মা? বেঁচে যদি থাক, আশা সফল হতে পারে। মরে গিয়ে কে কবে অভীষ্ট লাভ করেছে? অদূরে ওই শ্রীকণ্ঠদেবের মন্দির। ওই মন্দিরের সেবক দীপ্ততেজা করুণাঘন ঋষি ঋতধ্বজ। তুমি তাঁর কাছে যাও। নিশ্চয় তিনি তোমার দুঃখমোচনে সাহায্য করবেন।'

অনন্ত গগনে মিলিয়ে গেলেন গগনবিহারী গুহ্যক। নতুন আশায় বুক বেঁধে উঠে দাঁড়াল চিত্রাঙ্গদা। তখন স্পষ্ট প্রভাতকাল। সুবৃহৎ সপ্তপর্ণী বৃক্ষের ফাঁকে, বনের লতায়-পাতায় লেগেছে অরুণকিরণের স্পর্শ। এদিকে ওদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করতেই দেখল চিত্রাঙ্গদা, কালিন্দীর দাক্ষিণোত্তরে বিশাল এক মন্দির—চূড়া যেন গগন স্পর্শ করেছে।

দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলল সে। জীবনে কি আশার শেষ আছে? মানুষ গভীর নৈরাশ্যে মৃত্যু কামনা করে—সে শুধু নতুন জীবনে বেঁচে ওঠার আশায়।

পরিত্যক্ত, ভগ্ন মন্দির প্রাচীরগাত্র ভেদ করে উঠেছে বৃহৎ জটিল বট। বনগুল্মঞ্চে বেষ্টিত বটজটা। মন্দির যেন ধ্যানমগ্ন জটাধারী যোগী—বুঝি শ্রীকণ্ঠের ধ্যানেই তন্ময়।

ভয় পেল না চিত্রাঙ্গদা। ভয়কে জয় করেছে সে। অসহ আঘাতে জেগেছে দুর্জয় সহনশক্তি।

মন্দিরে প্রবেশ করে দেখল, শূন্য মন্দির। সম্মুখে শ্রীকণ্ঠের মূর্তি—আর তাকে ঘিরে রয়েছে রাশীকৃত বিল্বপত্র আর কৃষ্ণধুস্তুর। বাসি নির্মাল্য আর নির্বাপিত ধূপগন্ধে গন্ধ-রহস্যে ভরা দেব-আয়তন।

কিন্তু, কোথায় ঋষি ঋতধ্বজ, যিনি দুঃখমোচন করবেন! ব্যাকুল আগ্রহে মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করল চিত্রাঙ্গদা।

মধ্যাহ্নকালে মধ্যাহ্নভাস্করের ন্যায় মন্দিরে প্রবেশ করলেন সামবেদী তপোধন ঋতধ্বজ। ভূরিতেজা মহর্ষি আহিত লক্ষণে লক্ষিত। চিত্রাঙ্গদা কেঁদে লুটিয়ে পড়ল তাঁর চরণমূলে।

করুণার্দ্রস্বরে বললেন কৃপালু ঋষি, 'কে তুমি? এই নির্মানুষ বনে কেন এসেছ?'

চিত্রাঙ্গদা অশ্রু-উচ্ছ্বাসে তাকে অভিশাপের কাহিনী নিবেদন করল।

শুনে ক্ষুব্ধ হলেন ঋষি। তারপর জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, 'পরদেয়া কন্যা। তোমার পিতা তোমার মনোনীত স্বামীর সঙ্গে তোমাকে যোজনা না করে কর্তব্যভ্রষ্ট হয়েছেন। অভিশাপের যোগ্য তিনি নিজে।'

সহসা উত্তেজিত হলেন ঋষি, উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'যে-পিতা কন্যাকে সুপাত্রে যোজিত না করে অভিশাপ দিয়েছেন, কপি-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে তাঁকে এই মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।'

পিতার ভয়ঙ্কর পরিণামের কথা শুনে কেঁদে উঠল চিত্রাঙ্গদা। পাপ কার? পিতার, না কন্যার? অপরাধী কে?—পিতা বিশ্বকর্মা, না কন্যা চিত্রাঙ্গদা? বিচার-মূঢ়া গন্ধর্ব-নন্দিনী। অশ্রু-উচ্ছ্বাসে কেঁপে কেঁপে উঠছে তার দেহ।

তাকে লক্ষ্য করে ঋতধ্বজ বললেন, তখন অনেকটা শান্ত কণ্ঠস্বর: 'কিন্তু মা, গন্ধর্বকুলে জন্মগ্রহণ করে গান্ধর্বধর্ম পালন করলেও, তুমিও অনুচিত কর্ম করেছ।'

একটু নীরব হলেন ঋষি। নির্জন মন্দিরে গমগম করতে লাগল তাঁর কণ্ঠস্বর। আদেশ প্রতীক্ষা করতে লাগল কম্পিতাঙ্গী চিত্রাঙ্গদা।

ঋষি বললেন, 'অনিরুদ্ধ অনঙ্গ, অতি প্রবল তার বেগ। তার

আক্রমণকে সহজে প্রতিহত করা যায় না। কিন্তু মা, যে প্রেম নিয়মকে লঙ্ঘন করে, সে কি প্রেম—না কুৎসিত কামনার আর এক রূপ? প্রেম মঙ্গল, প্রেম কল্যাণ; প্রেম আত্মার আলো, সনাতনী সৃষ্টির উৎস। কিন্তু তুমি প্রেম বলে যাকে মনে করেছ, তা কদর্য কাম—তার তৃপ্তি ভোগেচ্ছায়, আত্মসম্ভোগে। শৃঙ্খলাভঙ্গ করাই তার স্বভাব।'

স্তব্ধ চিত্রাঙ্গদা। মন্দিরে প্লুতস্বরে প্রতিধ্বনিত হয় ঋষির কণ্ঠ। তিনি আবার বলেন, 'বাইরের আলো, বাইরের রূপ, বাইরের ঐশ্বর্যকে তুমি দেখেছ—প্রেমের কল্যাণতম রূপকে দেখনি। তাকে লাভ করাও সহজ নয়। তাকে লাভ করতে হয় সুদুশ্চর তপশ্চর্যায়। তপস্যার আলো হয়ে সে হৃদয়ে প্রবেশ করে, ঘুমন্ত হৃৎকমলকে দলে দলে ফুটিয়ে তোলে। বিভোল-করা তার বর্ণ, মাতাল-করা তার সৌরভ। সম্ভোগ-স্পৃহাকে নিঃশেষে দগ্ধ করে ত্যাগের মন্ত্রে সে জাগিয়ে তোলে কল্যাণী সৃষ্টির সুর। শ্রীকণ্ঠদেবের মদনভস্ম তারই রূপক।'

ভয়ে ভয়ে শ্রীকণ্ঠদেবের মূর্তির দিকে তাকায় চিত্রাঙ্গদা। নীলকণ্ঠ শ্রীকণ্ঠ—বিশ্বের গরল পান করে বিশ্বকে গ্লানিমুক্ত করেছেন তিনি। তপস্যার বলে মদনকে ভস্ম করে কুমারসম্ভব সম্ভব করেছেন তিনি। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা কি করেছে?

অনুতাপে কেঁদে ওঠে চিত্রাঙ্গদা। গম্ভীর কণ্ঠে ঋষি বলেন, 'পিতাকে লঙ্ঘন করে যে স্বেচ্ছায় কামের বশ হয়, সে স্বয়ংসিদ্ধা নয়; ত্যাগশুদ্ধ হয়ে যে প্রেমের তপস্যায় নিজে নিজে সিদ্ধিলাভ করে—সে-ই প্রকৃত স্বয়ংসিদ্ধা। যদি সত্যি স্বয়ংসিদ্ধা নাম সার্থক করতে চাও, এই মন্দিরে তারই সাধনা কর।'

অদ্ভুত শব্দমন্ত্র। মুগ্ধার মত শোনে চিত্রাঙ্গদা, তারপর পাগলের মত লুটিয়ে পড়ে ঋষির চরণমূলে। অভয় হস্ত উত্তোলন করে তাকে আশীর্বাদ করেন পরম কারুণিক পাশুপতাচার্য। পশুপতি শিব-শঙ্করের উপাসক তিনি—শিবের মতই উদার; শঙ্করের মতই জগৎকল্যাণে নিযুক্ত।

নিবর্তসাধক তিনি নন, তিনি প্রবর্তসাধক। মদোন্মত্ত জগতে মঙ্গল প্রবর্তন করাই তাঁর ব্রত। তিনি জানেন, দুর্বার মদন-পীড়নে যৌবন-চাপল্যে যদি পদস্খলন ঘটে, তবে তার প্রায়শ্চিত্তও আছে। দুরন্ত কামই প্রেমে পরিণত হয় চিত্তের শুদ্ধিতে। কন্যার মঙ্গল কামনা করে তিনি সেই আশীর্বাদই করেন, 'শিবমস্তু'।

তারপর ধীরে তিনি বাইরে আসেন, রক্ত বনকুসুমের নির্যাসে মন্দির-গাত্রে লিখেন নিজের হৃদয়-লিখন।—

'যক্ষ, রক্ষ—মানুষ কি দেবতা—কেউ কি এ ত্রিদিবে নেই, যিনি ভৃশদুঃখিতা চিত্রাঙ্গদার দুঃখ মোচন করতে পারেন।'

লিখন লিখে নির্জন অরণ্যের নিবিড় ছায়ায় মিলিয়ে যান পরম কারুণিক পাশুপত ব্রতধী।

শ্রীকণ্ঠদেবের মন্দিরে চিত্রাঙ্গদা একা। দুঃখের দহনে দগ্ধ চিত্ত। বারবার হৃদয়ে জাগে কুমার সুরথের মূর্তি। কি অনুপম রূপ, কি সুমোহন মাধুরী! পরক্ষণেই শিউরে ওঠে সে। সে অভিশপ্তা। প্রিয়তমের সঙ্গে মিলন হবে না তার। অকারণেই আবার ভাবে চিত্রাঙ্গদা, কেন হবে না? প্রেম কি পাপ? কে যেন গম্ভীরস্বরে বলে, প্রেম নয়, কামকে সে প্রশ্রয় দিয়েছে। দৃঢ়স্বরে বলে চিত্রাঙ্গদা—না, পদ্মিনী চিত্রাঙ্গদা ভুল করে নি। প্রেমকেই গ্রহণ করেছে সে। যদি কিছু ত্রুটি থেকে থাকে, তপশ্চরণে সে সে-ত্রুটি দূর করবে, অন্তরে গ্রহণ করবে শুদ্ধ প্রেমের বিশুদ্ধ আলো। স্বয়ংসিদ্ধাই সে হবে, স্বয়ং সিদ্ধি অর্জন করবে সে প্রেমের তপস্যায়।

ক্ষীণ অঙ্গে শুদ্ধ সঙ্কল্পে অদ্ভুত শক্তি জাগে। ওই শ্রীকণ্ঠ,—কামকে দগ্ধ করে প্রেমকে জাগিয়েছেন তিনি। শ্রীকণ্ঠপ্রিয়া পার্বতী। কি কঠিন তাঁর প্রেমের তপস্যা! পতিরূপে পশুপতিকে কামনা করেছিলেন পর্বত-রাজনন্দিনী। স্বল্পাহার, অর্ধাহার—শেষপর্যন্ত পর্ণপত্রে জীবন ধারণ। প্রেমের জন্য 'অপর্ণা', পার্বতী, প্রেমের জন্য 'পঞ্চতপা' পার্বতী। গ্রীষ্মের

দিনে প্রচণ্ড অনলশিখার সম্মুখে তাঁর দুঃখের পরীক্ষা, নিদারুণ শীতে হিমশয়নে রাত্রিজাগরণে তাঁর চিত্তের শুদ্ধি।

এই শুদ্ধি, এই সিদ্ধি আনতে হবে জীবনে। অর্ধাহারে, অনাহারে শরীর বিশীর্ণ করল চিত্রাঙ্গদা। সকল চিন্তা থেকে মনকে বিমুক্ত করে এক ধ্যানে তন্ময় হল সে। কার ধ্যান? কুমার সুরথ?—অপূর্ব যার তনুশ্রী, চোখে যার তৃষাতুর দৃষ্টি? না—না। চিত্রাঙ্গদা এ সুরথকে চায় না। এ মৃগতৃষ্ণিকা, এ মিথ্যা। তপোবলে প্রেমের দীপশিখায় সে শুদ্ধ, সত্ত্বগুণসম্পন্ন প্রেমিক সুরথকে দেখবে। দেহতটে রূপতরঙ্গের আঘাতে সে চঞ্চল হবে না। রূপ দিয়ে রূপতৃষ্ণাকে মিটাতে চেয়েছিল বলেই তো জীবনে এসেছে দুঃখ, বিরহ, ক্রন্দন।

আজ চিত্রাঙ্গদার শুদ্ধ প্রেমের তপস্যা—যে প্রেমে অভিশাপ নেই, বিরহ নেই, দুঃখ নেই। পূত হোমশিখায় আজ নিঃশেষে সম্ভোগের আহুতি। ভোগলুব্ধা চিত্রাঙ্গদা দগ্ধ হয়ে গেছে। নতুন জীবনে জন্ম নিয়েছে নতুন এক চিত্রাঙ্গদা। গন্ধর্ব সে। কুটিল কামনার ইন্ধন নয়—সে বেদগর্ভ ব্রহ্মার কমলবদনের নির্মল হাস্য-কান্তি, ভাবগম্ভীর সুন্দর আত্মার সৌরভ। সে প্রেমের স্বপ্নকান্তি, শুভ্র জ্যোৎস্না।

বাইরে কালের আবর্তনপথে আসে দিন আসে রাত্রি। মন্দির-ভিতরে স্তব্ধ যেন কালপ্রবাহ। সেখানে শীত নেই, বর্ষা নেই—অনন্ত বসন্ত, অনন্ত জ্যোৎস্না। চিত্রাঙ্গদার স্বপ্নে আজ কুমার সুরথ—মদন নয়, মদনান্তক শিব—শুদ্ধ, সুন্দর, জিতকাম। মরি, মরি—কি রূপ! এ যে চন্দ্রের সুষমা, পদ্মের সৌরভ। প্রেমের অনির্বাণ শিখায় সমুজ্জ্বল দয়িত সুরথ। সে দূরে নয়, অন্তরিত নয়—তার অন্তরে। এই যে সে। তার হৃদয়ভরা প্রেমের আলো।

আনন্দে চোখ মেলে তাকায় চিত্রাঙ্গদা।

আশ্চর্য! মন্দিরে এসে প্রবেশ করেছেন কৃপালু পাশুপতাচার্য

ঋতধ্বজ, তাঁর সঙ্গে পিতা বিশ্বকর্মা। তাঁর পশ্চাতে কে ও! চিত্রাঙ্গদার ধ্যানের ধন? কুমার সুরথ?

মুগ্ধার মত উঠে দাঁড়াল চিত্রাঙ্গদা।

গভীর মন্দ্রে বললেন ঋতধ্বজ, 'মা, তপস্যার অসাধ্য কিছুই নেই। কঠিন তপোবলে শাপমুক্ত পিতা, আর তপঃশুদ্ধ পতি—দুইকেই লাভ করলে তুমি। এই সেই কুমার সুরথ, তোমার বিরহে যে দুশ্চর তপস্যায় নিযুক্ত হয়েছিল।'

মন্দির যেন আলোয় আলোয় ভরে উঠেছে, দিব্য সঙ্গীতে মুখর যেন দেব-দেউল।

দীপ্ততেজা সুরথের হাত ধরে এগিয়ে এলেন গন্ধর্বরাজ বিশ্বকর্মা। পরম স্নেহে চিত্রাঙ্গদার হাতখানি নিয়ে সুরথের হাতে মিলিয়ে দিলেন, সানন্দে বললেন, 'মা, সুখী হও।'

আনন্দবিহ্বলা চিত্রাঙ্গদা। পিতা ও ঋষির চরণে প্রণতা হল সে। সুগম্ভীর প্লুত স্বরে বললেন শৈবাচার্য ঋতধ্বজ, 'স্বয়ংসিদ্ধা চিত্রাঙ্গদা আজ সত্যি স্বয়ংসিদ্ধা হল।'

সুতানে দিব্য বাদ্য বেজে উঠল। গন্ধর্বকণ্ঠের সুললিত সঙ্গীতে পূর্ণ হয়ে উঠল সিদ্ধিনাথ শ্রীকণ্ঠদেবের মন্দির। দেবতা যেন আশীর্বাদ করছেন তপঃসিদ্ধা স্বয়ংসিদ্ধাকে।

বীর্যশুল্কা ॥

সহসা স্বয়ম্বর সভায় সঙ্কট সূচিত হল।

বিশালরাজকন্যা স্বয়ম্বরা হবেন। দেশ-বিদেশে ঘোষণা পড়ে গিয়েছে। রাজভবনে সমবেত হয়েছে মদ্র, মগধ, বিদর্ভের রাজকুমার। সকলের পুরোভাগে বসেছে করন্ধম-পুত্র অবীক্ষিত। মুখে বীর গাম্ভীর্য, চোখে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের চিহ্ন। আকাশ-সূর্যের মত তেজস্বী অবীক্ষিত।

অন্যান্য রাজকুমার বসেছে তার পাশে। সূর্য-দীপ্ত অবীক্ষিতের তুলনায় তারা যেন হীনদীপ্ত জ্যোতিষ্ক। তবু ঠাট কম নয়। বেশ-ভূষায়, আড়ম্বরে, ঐশ্বর্যের ঘটায় সকলেই যেন দ্বিতীয় অবীক্ষিত।

এগিয়ে এল রাজকন্যা ভামিনী, সমুজ্জ্বল বিদ্যুল্লেখা। কপালে-কপোলে পত্রলেখা, বেণীবদ্ধ কুন্তল, অঙ্গে সুবিন্যস্ত রক্তচেলী। পশ্চাতে মাল্য-চন্দনের স্বর্ণ থালা হস্তে সুবেশা সখীর দল।

রাজপুত্র-গ্রহে চাঞ্চল্য। মোহিত চকিত সভাতল।

রাজকন্যা ভামিনী এক একজন রাজপুত্রের সম্মুখে দাঁড়াচ্ছেন। বংশ-পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে সুবিজ্ঞ ভাট, 'এই সেই রাজকুমার—'

রূপকুমারী বৈশালিনী অবীক্ষিতের সামনে এসে দাঁড়াল। সভাস্থলে কলগুঞ্জন উঠল। সুললিত কণ্ঠে বলতে লাগল বংশ-স্তোতা ভাট, 'এই সেই করন্ধম-পুত্র অবীক্ষিত—বীর বলাশ্বের পৌত্র, রাজা বীর্যচন্দ্রের

ঋতধ্বজ, তাঁর সঙ্গে পিত্মা বিশ্বকর্মা। তাঁর পশ্চাতে কে ও! চিত্রাঙ্গদার ধ্যানের ধন? কুমার স্থরথ?

মুগ্ধার মত উঠে দাঁড়াল চিত্রাঙ্গদা।

গভীর মন্দ্রে বললেন ঋতধ্বজ, 'মা, তপস্যার অসাধ্য কিছুই নেই। কঠিন তপোবলে শাপমুক্ত পিতা, আর তপঃশুদ্ধ পতি—ছুইকেই লাভ করলে তুমি। এই সেই কুমার স্থরথ, তোমার বিরহে যে দুশ্চর তপস্যায় নিযুক্ত হয়েছিল।'

মন্দির যেন আলোয় আলোয় ভরে উঠেছে, দিব্য সঙ্গীতে মুখর যেন দেব-দেউল।

দীপ্ততেজা স্থরথের হাত ধরে এগিয়ে এলেন গন্ধর্বরাজ বিশ্বকর্মা। পরম স্নেহে চিত্রাঙ্গদার হাতখানি নিয়ে স্থরথের হাতে মিলিয়ে দিলেন, সানন্দে বললেন, 'মা, সুখী হও।'

আনন্দবিহ্বলা চিত্রাঙ্গদা। পিতা ও ঋষির চরণে প্রণতা হল সে। স্থগম্ভীর প্লুত স্বরে বললেন শৈবাচার্য ঋতধ্বজ, 'স্বয়ংসিদ্ধা চিত্রাঙ্গদা আজ সত্যি স্বয়ংসিদ্ধা হল।'

স্থতানে দিব্য বাদ্য বেজে উঠল। গন্ধর্বকণ্ঠের স্থললিত সঙ্গীতে পূর্ণ হয়ে উঠল সিদ্ধিনাথ শ্রীকণ্ঠদেবের মন্দির। দেবতা যেন আশীর্বাদ করছেন তপঃসিদ্ধা স্বয়ংসিদ্ধাকে।

॥ বীর্যশুল্কা ॥

সহসা স্বয়ম্বর সভায় সঙ্কট সূচিত হল।

বিশালরাজকন্যা স্বয়ম্বরা হবেন। দেশ-বিদেশে ঘোষণা পড়ে গিয়েছে। রাজভবনে সমবেত হয়েছে মদ্র, মগধ, বিদর্ভের রাজকুমার। সকলের পুরোভাগে বসেছে করন্ধম-পুত্র অবীক্ষিত। মুখে ধীর গাম্ভীর্য, চোখে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের চিহ্ন। আকাশ-সূর্যের মত তেজস্বী অবীক্ষিত।

অন্যান্য রাজকুমার বসেছে তার পাশে। সূর্য-দীপ্ত অবীক্ষিতের তুলনায় তারা যেন হীনদীপ্ত জ্যোতিষ্ক। তবু ঠাট কম নয়। বেশ-ভূষায়, আড়ম্বরে, ঐশ্বর্যের ঘটায় সকলেই যেন দ্বিতীয় অবীক্ষিত।

এগিয়ে এল রাজকন্যা ভামিনী, সমুজ্জ্বল বিদ্যুল্লেখা। কপালে-কপোলে পত্রলেখা, বেণীবদ্ধ কুন্তল, অঙ্গে সুবিন্যস্ত রক্তচেলী। পশ্চাতে মালা-চন্দনের স্বর্ণ থালা হস্তে সুবেশা সখীর দল।

রাজপুত্র-গ্রহে চাঞ্চল্য। মোহিত চকিত সভাতল।

রাজকন্যা ভামিনী এক একজন রাজপুত্রের সম্মুখে দাঁড়াচ্ছেন। বংশ-পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে সুবিজ্ঞ ভাট, 'এই সেই রাজকুমার—'

রূপকুমারী বৈশালিনী অবীক্ষিতের সামনে এসে দাঁড়াল। সভাস্থলে কলগুঞ্জন উঠল। সুললিত কণ্ঠে বলতে লাগল বংশ-স্তোতা ভাট, 'এই সেই করন্ধম-পুত্র অবীক্ষিত—বীর বলাশ্বের পৌত্র, রাজা বীর্যচন্দ্রের

দৌহিত্র। শশাঙ্কের মত কান্তি, বৃহস্পতির মত বুদ্ধি, সমুদ্রের মত শক্তিধর এই রাজকুমার। অনেক রাজকন্যার ধ্যানের ধন ইনি।'

ক্ষণেক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল সুকন্যা ভামিনী। শান্ত দৃষ্টি প্রসারিত করে কি যেন দেখল, কি যেন ভাবল। তারপর অবীক্ষিতকে অতিক্রম করে মরালগতিতে ধীরে অগ্রসর হল সে।

ক্রুদ্ধ সিংহের মত উঠে দাঁড়াল অবীক্ষিত, গর্জন করে বলল, 'বিশাল-তনয়া কি অন্ধ?'

ফিরে দাঁড়াল সুনেত্রা ভামিনী। অপূর্ব গ্রীবাভঙ্গ,—স্থির, কঠিন কটাক্ষ। সে কটাক্ষে আশ্চর্য সম্মোহন। সখীদের উদ্দেশ্য করে বলল মদিরেক্ষণা, 'ঈক্ষণ-শক্তি কি কেবল রাজপুত্র অবীক্ষিতের? সখি, তোরা সভাকে জানিয়ে দে, রাজকন্যা ভামিনী গর্বান্ধকে বরণ করে না।'

'তিনি কাকে বরণ করেন?'—কম্বুকণ্ঠে শুধাল অবীক্ষিত। তার কথায় শ্লেষ।

তেজোদৃপ্তস্বরে বলল রাজকন্যা, 'যিনি বীর, বিশালরাজতনয়া তাঁকেই বরণ করে। বীরবাহুর বীর্যই তার শুল্ক।'

মরালের মত গ্রীবাভঙ্গি করে মরাল গমনে সম্মুখে পদক্ষেপ করল ভামিনী। নূপুরের শিঞ্জন মিশল কিঙ্কিণী-ঝঙ্কারে। সখীদের চাপা চপল হাসিতে রাজসভা চঞ্চল হয়ে উঠল।

ক্রোধে আরক্ত করন্ধম-পুত্র। মাথায় যেন আগুন জ্বলে তার। বীর্যশুল্ক। বীর্যশুল্কা হতে চায় বিশাল-নন্দিনী। ক্ষত্রিয়ের রক্ত উষ্ণ হয়ে ওঠে। বীরের রক্তধারা তার দেহে; পিতা তার বীর করন্ধম, মাতা বীর্যচন্দ্রের কন্যা বীরাঙ্গনা বীরা, শস্ত্র-শাস্ত্র বিশারদ ঋষি কাণ্বের নিকট তার অস্ত্র-শিক্ষা। বীর্যশুল্ক প্রদানে অসমর্থ নয় বীর অবীক্ষিত।

'উত্তম, তাই হক। বীর্যশুল্কেই গৃহীতা হন বীরাঙ্গনা'—বিদ্যুৎগতিতে অগ্রসর হয়ে বলোন্মত্ত অবীক্ষিত সবলে রাজকন্যার পাণি ধারণ করল।

ভীতা, সন্ত্রস্তা সখীর দল। ঝন্‌ঝন্ শব্দে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল অগুরুবাসিত বরণ ডালা, কন্‌কন্ শব্দে বেজে উঠল সভীত কঙ্কণ।

শূরের স্পর্শে ভামিনীর শিরায় শিরায় অননুভূত শিহরণ। অজানা আশঙ্কা, অজানা সুখ। আনন্দে, আতঙ্কে বিহ্বল বৈশালিনী। বিচিত্র এ অনুভূতি।

হাজার বীরের রণহুঙ্কারে স্বয়ম্বর সভা সচকিত হয়ে উঠল, 'এত স্পর্ধা অবীক্ষিতের!'

বাহু আস্ফালন করে বলল উন্মত্ত মদ্রকুমার, 'ক্ষাত্রবীর্য কি নির্বীর্য?' সদম্ভে বলল বিদর্ভ-নন্দন, 'সমবেত রাজগণের মধ্যে বীর কি শুধু অবীক্ষিত?' সঙ্গে সঙ্গে সহস্র কণ্ঠে ধ্বনি উঠল, 'অস্ত্র গ্রহণ কর, হে বীর ভূপালবৃন্দ, অস্ত্র গ্রহণ কর। 'ভূপ' নামের অমর্যাদা কর না,— বলগর্বে উন্মত্ত দাম্ভিককে দমন কর।'

পলকে স্বয়ম্বর সভা সমর ক্ষেত্রে পরিণত হল। অগ্নিশিখার মত ঝলক দিয়ে উঠল উদ্যত কৃপাণ। মুষলধারে মুষল বৃষ্টি, নিশিত শরজালে সমাচ্ছন্ন সভার স্বর্ণ-দীপ্তি। মেঘ উঠেছে, ঝড় জেগেছে— হান-হান শব্দে ছুটেছে প্রমত্ত পবন। পাগল বনস্পতি, ঝড়ের ঝাপট তারই ওপর। সুদুর্মদ রাজকুলের আক্রমণে আক্রান্ত বীরাপুত্র অবীক্ষিত।

কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই অবীক্ষিতের। রক্তস্নাত বীর যেন রক্তাম্বর পরিহিত বিবাহের বর। শানায়ের মধুর সুরে তার বাসর মুখর নয়, চিত্রিত চন্দ্রাতপতলে ভীষণ সমর-ডম্বর। মঙ্গল শঙ্খরবে নয়, ছিন্ন মহাশঙ্খের বিকট চিৎকারে আজ বধূবরণ। বধূ তার বীর্যশুল্কা; উগ্রবীর্য বিবাহের পণ; শত্রুজয়ে পণ্যার কনকাঞ্জলি। হুঙ্কারে গর্জনে উল্লসিত বর অবীক্ষিত, যেন রক্ত সুরায় নব অধিবাস হয়েছে তার।

এদিকে বরের তাণ্ডবে কাঁপছে পতিংবরা কুমারী। দেহতটে বিপুল পুলকাঞ্চন, নয়ন পল্লবে পুষ্পিত শিহরণ। তুফান-সাগরে বাসর বেঁধেছে শৌর্য-শুল্কা বৈশালিনী, মৃত্যুর মুখে দেখছে শূরের সৌন্দর্য। বর তার এত সুন্দর! বীর্যশুল্ক এত মহার্ঘ, এত মধুর!

কিন্তু, একা অবীক্ষিত, বিপক্ষ সপ্তশত অসুর শূর। তারা ধর্মযুদ্ধ জানে না। ছলে বা কৌশলে শত্রুকে নির্জিত করাই তাদের ধর্ম।

চিরকাল নিয়মহীন দানবশক্তি, শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম। তাই, বীর হয়েও পরাজিত হল অবীক্ষিত ; একটি অপূর্ব শৌর্য মহিমা বন্দী হল অসুর-শক্তির কবলে। বিজয়ীর জয়-নাদ যেন বজ্রগর্ভ শূল।

ক্ষতবিক্ষত বিশাল-তনয়া। আতঙ্কে মুখ ঢাকল সে। অতল-সাগরে তলিয়ে যাচ্ছে বুঝি সুখের বাসর।

বন্দী বীর আর বীর্যশুল্কা কন্যাকে নিয়ে আসা হল বিশাল-রাজের সম্মুখে। দলিত উরগের মত নিঃশ্বাস ফেলছে বন্দীবীর ; পরাজিত, তবু গূঢ় গর্ব।

অধর্ম-দম্ভে স্ফীত মদ্র, মগধ, বিদর্ভদেশের রাজকুমার। তারাও এগিয়ে এল, যেন রক্তমুখ বিষস্ফোটক। উল্লাসে বাহু আস্ফালন করছে ক্লিষ্টকর্মা বিজয়ীর দল। বিজিত অবীক্ষিতের মহিমান্বিত ধীর গাম্ভীর্যের পাশে অতি বিশ্রী এই বাহ্বাস্ফোট।

বিশাল-রাজ নিজ কন্যাকে উদ্দেশ্য করে গম্ভীর স্বরে বললেন, 'কন্যা, তোমার সত্য রক্ষা কর। এই বিজয়ী বীরবর্গের মধ্যে তোমার যাঁকে অভিলাষ, তাঁকে বরণ কর।'

নীরব ভামিনী। বর-নির্বাচনের উৎসাহ তার স্তিমিত হয়ে গিয়েছে। মনের অতলে যে বীর বরের আসনে অর্চিত, সে আজ পরাজিত। কিন্তু নির্জিত কি তার বীরত্ব মহিমা ? শূন্য দৃষ্টি বৈশালিনী। কি করবে, কি বলবে, ভেবে পায় না সে।

গম্ভীর কণ্ঠে রাজা আবার বলেন, 'বল, কোন্ বীরকে বরণ করবে তুমি ?'

বাহু আস্ফালন করে এগিয়ে আসে মদ্রকুমার। নয়নে কদর্য কামলালসা। তাকে সরিয়ে দিয়ে সদম্ভে সম্মুখে এসে দাঁড়ায় বিদর্ভ-নন্দন, যেন বিশাল বসুন্ধরায় বীর কেবল সেই-ই, জয়মাল্য তারই প্রাপ্য।

ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিল সুন্দরী ভামিনী। বীরাঙ্গনা সে; বীরকে

চেনে। সে জানে, অসুরত্ব শূরত্ব নয়, সত্য নয় সূর্যের হিরণ্ময় পাত্র। যারা বিজয়ী হয়েছে, তারা কেউ বীর নয়। বীর্যশুল্কার শুল্ক কি দানব-শক্তি ?

সহসা রাজদ্বারে তুমুল কোলাহল উঠল। রণডঙ্কায় রণের নব আহ্বান। মদ্র-বিদর্ভকুমারের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। দ্রুতপদে দূত এসে জানাল, 'মহারাজ, পুত্রের পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে সসৈন্যে এসেছেন রাজা করন্ধম।'

'করন্ধম! ত্রিলোকমান্য মহাত্মা করন্ধম!'

'হাঁ মহারাজ, তিনি। তুমুল যুদ্ধ বেধে গিয়েছে। নির্মূল রাজন্যকুল।'

'তাহলে মদ্র ও বিদর্ভ রাজকুমারদের এবার অগ্রসর হওয়া উচিত'—মেঘ-গম্ভীর স্বরে মন্তব্য করলেন বিশালরাজ।

ভয়ে পলায়নের সুযোগ খুঁজছে ভীরুর দল। বিবাহ করতে এসে একি বিপদ? শুষ্কস্বরে মদ্রকুমার বলল, 'আমার রথ কোথায়?' বিদর্ভ-কুমার জড়িতকণ্ঠে বলল, 'আমার সারথি কোথায় গেল?'

ত্রস্তে বেরিয়ে গেল কৌশলী ভীরুর দল। সন্ত্রস্তে প্রবেশ করল অন্য এক রাজদূত, 'মহারাজ, হতবীর্য ক্ষাত্রবীর্য। সভাদ্বারে উপস্থিত বিজয়ী করন্ধম।'

অর্ঘ্যসহ অগ্রসর হলেন বিশাল-রাজ। স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে তিনি রাজা করন্ধমকে প্রত্যুদ্গমন করলেন। সার্বভৌম সম্রাটের মত গর্বোন্নত শিরে সভায় প্রবেশ করলেন অমিততেজা করন্ধম। সচল হিমাচল, মণিকাঞ্চনদীপ্ত কিরীট যেন সূর্য করে উদ্ভাসিত গৌরীশৃঙ্গ।

ততক্ষণে বন্ধনমুক্ত হয়েছে অবীক্ষিত। তার বুকে পরাজয়ের অসহ গ্লানি। নয়নে অনল উচ্ছ্বাস। লজ্জায় পিতার দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারে না সে। পিতার সম্ভ্রম-স্তম্ভকে যেন সে আনত করেছে, জননী বীরার মর্যাদাকে সে কলঙ্কভূষিত করেছে। নতশিরে দাঁড়িয়ে থাকে লজ্জিত অবীক্ষিত।

বিস্ময়ে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে আছে পতিংবরা কন্যা ভামিনী।

অর্চিত হয়ে আসনে বসলেন বিজয়ী করন্ধম। মুহূর্তের দৃষ্টি সঞ্চালনে সভা নিরীক্ষণ করলেন তিনি। দেখলেন, সভাসদ্-সদস্যে ভরা নির্বাক মণ্ডপ, দেখলেন লজ্জিত পুত্রের আনত আনন। তারপর বিশাল রাজতনয়াকে সম্বোধন করে বললেন, 'এবার তাহলে বিজয়ী রাজকুমার অবীক্ষিতকে তুমি বরণ কর মা!'

নতুন বরণডালা নিয়ে এগিয়ে এল সখীর দল। গন্ধধূপে অধিবাসিত বরণডালায় জ্বলছে সুমঙ্গল ঘৃতপ্রদীপ। মঙ্গল শঙ্খ বেজে উঠল রমণী-অধরে, মঙ্গল হুলুরব। পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণের জন্য প্রস্তুত হল। হর্ষিতা, রোমাঞ্চিতা ভামিনী। বাঞ্ছিত বর-বরণ উদ্দেশ্য বরণডালা থেকে চন্দন-চর্চিত বরণমালা গ্রহণ করতে উদ্যত হল সে।

কিন্তু রাজকন্যার বরণমালা তোলা হল না। তার চম্পকসম অঙ্গুলি চাঁপা ফুলের মালায় সংলগ্ন হয়ে রইল। পিতৃসন্নিধানে উচ্চ সুস্পষ্টকণ্ঠে ঘোষণা করল অবীক্ষিত, 'আমি বিজয়ী নই—বিজিত। পুরুষের গর্ব পৌরুষ। যে কন্যার সম্মুখে আমার পৌরুষ ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তাকে আমি পত্নীরূপে গ্রহণ করতে পারি না।'

নিস্তব্ধ সভা গৃহ। চিত্রার্পিতের ন্যায় নিশ্চল রাজকন্যা। তার মনে হচ্ছে মেদিনী যেন অতি দ্রুত তার চরণতল থেকে সরে যাচ্ছে, চোখের সামনে বিদ্যুৎবেগে ঘুরছে সভা মণ্ডপ।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করেন নৃপতি করন্ধম, 'পিতার জয়েই পুত্রের জয়। পিতার সম্পদ-শীলে চির অধিকার পুত্রের।'

'পিতার সম্পদে পুত্রের অধিকার থাকতে পারে, কিন্তু শীলে নয়, ব্যক্তিগত শৌর্যেও নয়'—ক্ষুব্ধ কণ্ঠে উত্তর করে অবীক্ষিত: 'বীর্যশুল্কে পণ্যা যে রাজকন্যা, তার পণ বরের দেয়। আমি সে পণ দিতে পারিনি। কুমারী ভামিনী অন্য কোন বিজয়ী বীরকে বরণ করুন।'

ক্রন্দন-উচ্ছ্বাসে ভরা যেন অবীক্ষিতের কণ্ঠ! সে উচ্ছ্বাস সভায় করুণ মূর্ছনার সৃষ্টি করে। রুদ্ধকণ্ঠে অবীক্ষিত আবার বলে, 'রাজকন্যাকে

আমি গ্রহণ করব না, করতে পারি না। আমি পরাজিত, অবলার মতই পরবশ। সবলার পাণি-পীড়ন দূরের কথা, 'আমি প্রতিজ্ঞা করছি, জীবনে অন্য কোন কামিনীরও করস্পর্শ করব না।'

চঞ্চল হয়ে ওঠেন রাজা করন্ধম। বাধা দিতে গিয়ে পুত্রের জ্বলন্ত মুখের দিকে চেয়ে থেমে যান তিনি। মানীর সম্মানে আঘাত করতে পারেন না মানী। কিন্তু অন্তর তার সায় দেয় না।

বিশাল-রাজ বলেন, 'শোন ভামিনী, রাজপুত্র অবীক্ষিতের প্রতিজ্ঞার কথা শোন। তোমার যদি কোন বক্তব্য থাকে, নিঃসঙ্কোচে বল।'

শিউরে ওঠে রাজকন্যা। লজ্জা, সঙ্কোচ, ত্রাস। পুষ্পিতা কুসুম আবার কলির ভিতরে আত্মগোপন করতে চায়। কিন্তু ফোটা-ফুল আর কলিকা হতে পারে না, বৃন্তে আত্মগোপনও করতে পারে না। বিধাতার ইচ্ছায় ফুটে উঠেছে সে বিপুল বিশ্বে, নীল আকাশের তলে। হয় সে শুকিয়ে যাবে, ঝরে যাবে—নয় সে ধন্য হবে নিবেদিতা হয়ে।

ধীরে ধীরে মুখ তোলে ভামিনী, ভীত নেত্রে তাকায় সভার দিকে। তারপর কম্পিত কণ্ঠে বলে মধুকণ্ঠী, 'অধর্ম যুদ্ধে পরাজিত রাজপুত্রের পৌরুষ ক্ষুণ্ণ হয়নি। বহুজন কর্তৃক আক্রান্ত হয়েও রণকেশরীর মত পরাক্রম প্রদর্শন করেছেন বীর কুমার। তিনি অপরাজেয়, অপরাজিত। বীর্যশুল্কার উচিত শুল্ক তিনিই অক্লেশে দান করেছেন। আমি মনে-প্রাণে এই বীরকেই বরণ করেছি। বীর অবীক্ষিত আমার পতি।'

স্তব্ধ সভায় অদ্ভুত স্বরকম্পন। মধুর স্বরাঘাতে কাঁপে রাজা করন্ধমের হৃদয়তন্ত্রী, জাগে আশার ভৈঁরো। ধীর অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে বলে চলে বীরাঙ্গনা ভামিনী, 'আমি কামনার দাসী নই, বীরের দয়িতা। বীর্যই আমার শুল্ক, সেই বীর্যপণে ইনি আমায় ক্রয় করেছেন। বীর অবীক্ষিত ভিন্ন অন্য কেউ আমার পতি নয়। ভামিনী কামিনী নয়, স্বৈরিণীও নয়, বিশাল রাজকন্যা সতী—এক পতিকেই সে ভজনা করে!'

দীপ্তকণ্ঠে দীপ্তঝঙ্কার। জ্যোতির আভা খেলা করে বীর্যশুল্কা

ভামিনীর বদনে। সপ্রশংস দৃষ্টিতে ভামিনীর দিকে তাকান বীর করন্ধম। সত্যি বীর্যশুল্কের যোগ্যা এই কন্যা, বীরত্বই এই বীরাঙ্গনার মূল্য। নারীর বীরত্ব কি কেবল শস্ত্র-চালনায়? নারীর বীরত্ব সতীত্বে, নারীর বীরত্ব স্পষ্ট মর্মসত্য ভাষণে! হৃদয়ের উপলব্ধিকে কে এমন স্পষ্ট করে বলতে পারে? তিনি পুত্রকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'পুত্র, এ বীরাঙ্গনাকে গ্রহণ করা উচিত।'

করজোড়ে বলে অবীক্ষিত, 'পিতা, আপনি আমায় অন্য আদেশ করুন। যে কন্যার সম্মুখে আমার বীর্য পরাভূত, তাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করলে পত্নীই হবে পতির পতি। এঁকে আমি গ্রহণ করতে পারি না, অন্য কোন রমণীকেও নয়। কামনায় বীতরাগ হওয়াই আমার মত কাপুরুষের প্রায়শ্চিত্ত। আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করে আমি এই পরাজয়ের প্রায়শ্চিত্ত করব।'

বিফল হল পিতা করন্ধমের শাস্ত্রসম্মত বাক্য, বিফল হল বিশাল-পতির অনুনয়। কে কাতর নয়নে তাকাল, কার আশার মুকুল ব্যর্থ হয়ে ঝরে পড়ল—অবীক্ষিত তা বিচার করল না। সে স্থিরনিশ্চয়, তার মুখে এক কথা, 'আমি পরাজিত, নারীর পাণিপীড়ন করার যোগ্যতা আমার নেই।'

ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় ভামিনীর অন্তর। মুহূর্তের পৌরুষস্পর্শ বিস্মৃত হতে পারে না সে। সে কি শিহরণ! রক্তে রক্তে সে কি চাঞ্চল্য! ভামিনীকে যেন নতুন জীবনে জন্ম দিয়ে গিয়েছে পুরুষ দেহের সেই অমোঘ স্পর্শ। ভামিনী নারী, শাশ্বতী নারী। বীরত্বের অরুণ আবিরে সীমন্তিনী হয়েছে সে। যে বীরত্ব তার নারীত্বকে জাগিয়েছে, সেই বীরত্বই তার শুল্ক। এ শুল্ক যে-কেউ দিতে পারে না, যে কেউ দাবিও করতে পারে না। তপস্যার অমোঘ তেজে তেজস্বিনী কন্যাই শুধু এই পণ দাবি করতে পারে। ভামিনী কি সে তপস্যা করেছে? তাহলে কিসের দাবি তার?

মুহূর্তে স্থির সঙ্কল্পে দৃঢ় হয় ভামিনী, নয়নে স্থির বিদ্যুতের চমক।

ভিক্ষা সে চায় না, ভিক্ষুক প্রত্যাখ্যাত হয়। অধিকার যদি লাভ করতে পারে ভামিনী, কেউ তাকে ফিরিয়ে দিতে পারে না। সে অবলা নয়, সবলা—বীরাঙ্গনা। স্থিরকণ্ঠে সে বলে, 'এই রাজপুত্রই আমার ধ্যান, এই রাজপুত্রই আমার ধ্যেয়! ইনি যদি আমায় গ্রহণ না করেন, তপশ্চর্যাই হবে আমার জীবন-ব্রত।'

দীনকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠেন বিশালপতি, 'ভামিনী!' আকুলকণ্ঠে বলে ওঠে সখীর দল, 'সখী, এ যে ভীষণ পণ!' দীপ্তকণ্ঠে উত্তর করে বীরাঙ্গনা ভামিনী, 'পতি যার ব্রহ্মচারী, পত্নীও তার ব্রহ্মচারিণী। পতির আশ্রমই পত্নীর আশ্রম।'

শেষের দিকে কণ্ঠ যেন অশ্রুসজল হয়ে ওঠে, স্নিগ্ধমধুর বজ্রমন্দ্রে ভামিনী বলে, 'সূর্য সূর্যমুখীকে ত্যাগ করতে পারেন, ভুলতে পারেন—কিন্তু কি বসন্তে, কি বর্ষায়, সূর্যমুখী সূর্যকেই ধ্যান করে। ব্রহ্মচারিণী হয়ে চিরকাল তেমনই আমি এই বীরের ধ্যান করব।'

কাঞ্চনে সূর্যদীপ্তির ন্যায় বৈশালিনীর আননে মহিমাদ্যুতি ঝলমল করে। বীর করন্ধম এ মহিমার মাধুর্য বোঝেন। বীরাঙ্গনা বধূর করুণ-নয়ন তাঁর অন্তরে বেদনার বিশিখ হয়ে জাগে। তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে তিনি কাতর হন। একদিকে বংশ লোপের ভয়, অন্যদিকে পুত্রের সত্যভঙ্গের আশঙ্কা। নিজেকে কিছুতেই সান্ত্বনা দিতে পারেন না, মনে-প্রাণে অবীক্ষিতকেও সমর্থন করতে পারেন না। তবু শেষ চেষ্টা তিনি করেন, বলেন, 'পুত্র, এ পুণ্যবতীকে ত্যাগ করা তোমার উচিত নয়।'

অবীক্ষিতের এক উত্তর, 'পিতা, আমায় অন্য আদেশ করুন।'

স্বয়ম্বর-উৎসবের আনন্দ করুণ অশ্রু-উচ্ছ্বাসে পরিণত হল। সপুত্র রাজ্যে ফিরে গেলেন বিমর্ষ করন্ধম। পিতাকে প্রণাম করে বিদায় প্রার্থনা করল ভামিনী। দিনের আলো তখন প্রায় নিভে এসেছে।

কেঁদে উঠল স্নেহময় পিতার অন্তর। রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বললেন, 'পিতা তো তোমায় বিদায় দেয়নি মা! অনাদরও করেনি।'

স্নেহের স্পর্শে পাষাণের রুদ্ধ উৎস খুলে যায়। এতক্ষণ ভামিনী ছিল এক দৃঢ়তার দুর্গে, হৃদয়ের তেজে অটল, স্থির ধৈর্যে। মুহূর্তে ভেঙ্গে গেল দৃঢ়তার দুর্গ, ধৈর্যের প্রাকার। জলে ভরে উঠল নীল নয়ন। করুণস্বরে সে বলল, 'অনাদর! নিজের পিতার কাছ থেকেও বুঝি এত আদর পায় না কোন কন্যা। অজ্ঞাত পরিচয় কোন্ গন্ধর্বের ক্ষণ-বিলাসের সন্তান আমি, মাতাকে জানি না, পিতাকেও নয়। আপনি আমার মাতাপিতার অভাব পূরণ করেছেন। আপন কন্যার চেয়েও অধিক স্নেহে আমায় পালন করেছেন। আমি বুঝিনি, আমার মাতা নেই, পিতা নেই। কিন্তু পাত্রস্থ করার পূর্ব পর্যন্ত কন্যা পিতার পালনীয়া। পিতা তাঁর কর্তব্যের ত্রুটি করেন নি। কন্যা যোগ্যপাত্রে অর্পিতা হয়েছে। তার পরের সুখ-দুঃখ কন্যার ভাগ্য। সে ভাগ্যের দায়িত্ব আমি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করছি।'

যোগিনীর বেশ ধারণ করে একা অরণ্যপথে যাত্রা করল রাজকন্যা। করুণ দৃষ্টি মেলে পৃথিবীর কাছে শেষ বিদায় নিল দিনের আলো, সকরুণ সুরে বেজে উঠল সন্ধ্যার পূরবী। এমনি করেই প্রতি বিবাহান্তে বাজে বিদায় রাগিণী। অনেক নয়ন অশ্রুপূর্ণ করে, অনেক কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ করে এমনি করেই চিরকাল পতিগৃহে যাত্রা করে আদরিণী কন্যার দল।

ভামিনীও আজ পতিগৃহে যাচ্ছে। পতি তার বীর্যের তপ। বীর্যশুল্কা যোগিনীর অভিসার সেই তপস্যায় বিলাস-কুঞ্জে। সে কুঞ্জ কতদূর!

একাকী পথ চলছে রাজকুমারী। রাজকুমারী, কিন্তু নিরাভরণা। আজ তার যোগিনীর বেশ। মুছে গিয়েছে অঙ্গের অঙ্গরাগ, মুছে গিয়েছে অলক্ত-চিহ্ন। বনপথে কুশাঙ্কুরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত কোমল চরণ। ভ্রূক্ষেপ নেই ভামিনীর। কাঁটায় আঁচল জড়িয়ে যায়, দেহে

আঁচড় লাগে—কিন্তু সে থামে না। অন্তহীন চলার পথ অনন্ত হয়ে ওঠে গভীর জনহীন অরণ্যে।

একদিন, দুইদিন, তিনদিন পথ চলছে সে। অন্ধকার রাত আসে বিভীষিকার মত। জোনাকি যেন কবন্ধের চোখের আলো। মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলে নিমেষে নিভে যায়। রাত আরও ভয়াল হয়ে ওঠে, আরও অন্ধকার। কিন্তু ভামিনী নিজের অন্তর-প্রদীপে আলোময় করে নেয় নিশীথ রাত্রি। ভয়কে সে নিঃশেষে জয় করেছে। যে নারী রিক্তা, অর্পিতা—তার জীবনে ভয় কোথায়? চির নির্ভয় বীরাঙ্গনা।

বৈশালিনীর হৃদয়-পদ্মে একটি বীরের আসন। নয়নে একটি বীরের স্বপন। তার কল্পনায় যে কি গভীর উন্মাদনা, বোঝাতে পারে না ভামিনী। রক্তে রক্তে ঝড় ওঠে, শিরায় জাগে তুফান। সে স্পর্শ যেন বিদ্যুৎস্পর্শ। স্মরণ করতেও দেহের কণাগুলি আনন্দে চঞ্চল হয়ে ওঠে, রক্ত দুরন্ত শিশুর মত নৃত্য করে।

এই স্পর্শ কি আবার লাভ করবে না ভামিনী?

চম্‌কে ওঠে রাজনন্দিনী। সে স্পর্শের যোগ্যা কি সে? সে বিপুল পুলকভার সহ্য করার মত শক্তি কোথায়?—তার জন্য চাই কঠিন তপস্যা। বিলাসিনী রাজনন্দিনী প্রার্থনা করেছে, কিন্তু তপস্যা করে নি। বিলাস-কুঞ্জে বীরকুমারকে বন্দী করতে চেয়েছে সে সামান্য কামলালসায়। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা! ব্যর্থ তো সে হবেই। সে তো বীরের প্রেমকে জাগাতে পারেনি। তার জন্য যে চাই তপস্যা।

সেই কঠিন তপস্যার জন্য প্রস্তুত হয় ভামিনী। নতুন দেহশুদ্ধি, নতুন প্রস্তুতি। অল্পাহার ক্রমে অর্ধাহারে পরিণত হয়, অবশেষে নিরাহার। কৃশ তনু, অস্থিসার দেহ। ত্বক শুষ্ক হয়ে গেল, রূপ মলিন হয়ে গেল। রাজকন্যার কাজল সম কুটিল কুন্তল, রুক্ষ জটিল জটে পরিণত হল। মলদিগ্ধাঙ্গী বিশুষ্ক কমল। ভামিনী যেন কৃষ্ণাচতুর্দশীর চাঁদ। প্রাণমাত্র অবশিষ্ট।

ভামিনী ভাবে, কি কাজ এই জীবনে? আশা তো সফল হবে না।

সঙ্কল্পে স্থির বীর অবীক্ষিত। তিনি তো প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবেন না। তপোবনে যদি কাছেও আসেন তিনি, তিনি পত্নীকে গ্রহণ করবেন না। তবে কি কাজ এই জীবনে? নতুন জীবন যদি পায় সে, সেই জীবনে হয়তো সে অবীক্ষিতকে লাভ করতে পারে। সেদিন সমর্থা ভামিনীকে প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না অবীক্ষিত। বীর পত্নীর সৌভাগ্য তাকে দিতেই হবে। তাহলে অস্ত যাক্ কৃষ্ণাচতুর্দশীর চাঁদ, কুহু যামিনীর আঁধার পেরিয়ে মৃত্যুস্নান করে নবীন জীবনে জেগে উঠুক ব্যর্থকামা বিশালকন্যা।

আত্ম-বিসর্জনের জন্য কৃতসঙ্কল্প ভামিনী।

অনাহারে শীর্ণ দেহ। পর্ণশয্যায় যেন আগুন জ্বলছে। চোখে আঁধার নেমে আসে ভামিনীর। মৃত্যু কতদূর! নবজন্ম কত দূরের পথ! দূরের আকাশ আবছা হয়ে আসে। কোথায় গেল গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ! নয়নপল্লবে কাঁপছে নিঃসীম আঁধারের যবনিকা।

সহসা সেই অন্ধকারে যেন আলো জ্বলে উঠল। কোথায়?—চারদিকে চকিত চোখে তাকাল ভামিনী। হঠাৎ নির্জন অরণ্যে ধ্বনিত হল মধুর স্বর। কোথায়?—প্রাণপণ শক্তিতে উৎকর্ণ হল ভামিনী। কোথায়? কোথায়?

মনকে জোর করে নিজের অন্তরে নিয়ে এল সে। চমকে উঠল বিশাল-তনয়া। এ আলো জ্বলেছে নিজের মনে, কথা বলছে তারই অন্তরাত্মা। মধুরস্বরে যেন বলছে, 'জীবন কেন বিসজন দেবে? বীরের পত্নী তুমি, মনকে দৃঢ় কর। বীরবরকে অবশ্যই লাভ করবে। নিশ্চয় তুমি চক্রবর্তী রাজার জননী হবে।'

চক্রবর্তী রাজার জননী! নিরাশায় আশার একি আনন্দ শিহরণ! সর্বাঙ্গ কাঁপছে ভামিনীর। সে কেমন করে সম্ভব? রাজকুমার অবীক্ষিত তার স্বামী। তিনি তো তাকে অভিলাষ করেন না। ব্যর্থ হয়েছে বিশাল-রাজের অনুরোধ, ব্যর্থ হয়েছে মহাত্মা করন্ধমের মিনতি, উপেক্ষিত হয়েছে ভামিনীর অনুনয়। সঙ্কল্পে অটল তার পতি। তবে?

স্নিগ্ধস্বরে বলে মধুর আশা, 'অসম্ভবও সম্ভব হয়। প্রাণ-বিসর্জন দিও না। পুণ্যব্রতাকে ব্রতপতি নিরাশ করেন না।'

মোহন সম্মোহন। আশায় ধৈর্য ধরে রাজকন্যা, আশায় বুক বাঁধে। কৃষ্ণা চতুর্দশী কি চিরদিন থাকে? অমাবস্যার বুকে সুপ্ত রাকারজনীর সম্ভাবনা। পূর্ণতার আশায় মরে গিয়েও কলায় কলায় বৃদ্ধি পায় চাঁদ। ভামিনীর মনে তেমনি আবার লাগে আশার দোলা। আশায় প্রতীক্ষা করে রাজবালা।

একদিন গভীর রাতে স্বপ্ন দেখে ভামিনী। স্নানার্থিনী হয়ে সে যেন গঙ্গাহ্রদে এসেছে। কি সুন্দর শোভা গঙ্গাহ্রদের। অপূর্ব সৌন্দর্যে মণ্ডিত গঙ্গাহ্রদি বনভূমি। অর্জুন, শাল, পিয়ালের সারি। মৃগনাভি গন্ধে আমোদিত তীর। প্রকৃতির মধুর আশীর্বাদ। ধীরে সোপান বেয়ে হ্রদ-নীরে নামে সে। স্বচ্ছ নীল জল। চারদিক থেকে কলকল হেসে স্পর্শ করছে তাকে। বড় মধুর পরশ! আনন্দে আপন হারা ভামিনী শুভ্র স্ফটিক জল নিয়ে খেলা করে। হঠাৎ একি! একটা বিরাট বৃদ্ধ নাগ পা জড়িয়ে ধরেছে তার। শিউরে ওঠে ভামিনী। প্রাণপণে বন্ধন মুক্ত হতে চেষ্টা করে। কঠিন বন্ধন, জটিল নাগপাশ। যত জোর করে সে, তত তীব্র আকর্ষণ। বৃদ্ধনাগ সবলে তাকে পাতালের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে। চিৎকার করতে না করতে সে জলে ডুবে যায়, নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসে। সহসা দেখে, সে পাতালের নাগলোকে এসেছে। অদ্ভুত দেশ। চারদিকে শুধু নাগ আর নাগিনী। অনেকের ফণায় উজ্জ্বল মণিরত্ন। রত্নদ্যুতিতে দীপ্ত পুরী। একস্থানে শোভা পাচ্ছে একখানি শূন্য সোনার পালঙ্ক। সহসা বৃদ্ধ নাগ তার বন্ধন শিথিল করে দিল। প্রাণভয়ে দৌড়িয়ে সেই সোনার পালঙ্কে উঠে বসল রাজনন্দিনী। দেখতে দেখতে সোনার পালঙ্ক ঘিরে দাঁড়াল অসংখ্য নাগ, নাগপত্নী, নাগকুমার আর নাগকন্যা। কি আশ্চর্য! তাদের অর্ধেক দেহ মানুষের মত, পুচ্ছ শুধু নাগের। মানুষেরই মত কথা বলছে তারা, করছে কাজ। তারা সবাই পূজোপহার নিয়ে এসেছে।

একজন বলল, 'রাজকন্যা, এ সোনার পালঙ্ক আপনারই আসন।' উত্তর দিতে পারছে না ভামিনী। কে সে? সে কি? চিন্তার অবকাশ নেই। কেউ এসে তাকে সুগন্ধ অনুলেপনে অনুলিপ্ত করল, কেউ তার অঙ্গে পরিয়ে দিল মহার্ঘ রেশমবস্ত্র; একজনে বহুমূল্য পাতাল-ভূষণে ভূষিত করল তাকে। শুধু তাই নয়, তারপর তারা তাকে পূজা করতে লাগল, হাতজোড় করে সুললিত কণ্ঠে মধুর স্তবগান করতে লাগল, আর সুন্দরী নাগকন্যাগণ দেহকে লীলায়িত করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে নৃত্য শুরু করে দিল। কি বিচিত্র নাগনৃত্য, কি বিচিত্র লাস্যময় ভঙ্গি! একসঙ্গে দুলে দুলে উপরে উঠছে হাজার ফণা, একসঙ্গে নামছে—কখনও ফণায় হেলানো দোল্। অবাক হয়ে গেল ভামিনী। কোথায় এল সে? সুখময় স্বপ্নাবেশে সে প্রশ্ন করল, 'তোমরা এমন করে আমার পূজা করছ কেন?'

'আপনি আমাদের রক্ষাকর্ত্রী। আপনার কথার ওপর জীবন-মরণ নির্ভর করছে আমাদের।'

'সে কি!'—জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাল ভামিনী।

একজন নাগপত্নী বলল, 'বীরের পত্নী হবেন আপনি।' আর একজন বলল, 'রাজচক্রবর্তী মরুত্তের জননী হবেন আপনি। আমরা কোন কারণে তার কাছে অপরাধী হব। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের ভীষণ শাস্তি দিতে উদ্যত হবেন। তখন দয়া করে আপনি আপনার পুত্রকে নিষেধ করবেন। বলুন, এই অনুগ্রহ আপনি করবেন?'

নির্বাক ভামিনী। ক্ষেত্র নেই তার শস্য, ভর্তা নেই তার পুত্র! তবু কৌতুক বোধ করল সে। হেসে বলল, 'আমার পুত্র যদি তোমাদের শত্রুতা করে, নিশ্চয় আমি তাকে নিষেধ করব।'

নাগলোকে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। সহস্র সহস্র নাগ ফণা আনত করে কৃতজ্ঞতা ভরে লুটিয়ে প্রণাম করল তাকে।

স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। কোথায় রহস্যময় পাতালপুরী, কোথায় সেই নাগকন্যা! নির্জন বনের ব্রততল্পে শয়ান ভামিনী। কিন্তু, কি অদ্ভুত

স্বপন ! সে বীরের পত্নী হবে, রাজচক্রবর্তী পুত্রের জননী হবে। কি তার নাম ?—স্বপ্নের নাম মনে করতে পারে না সে। কিন্তু, জেগেও সেই মধুর স্বপ্নে বিভোর হয়।

দিন যায়, মাস যায়। ঋতুর আবর্তনে কাল এগিয়ে চলে। নির্জন বনে বীর পতির জন্য প্রতীক্ষা করে রাজকন্যা ভামিনী। সে শুনেছে—নাগ-স্বপ্ন বিফল হয় না।

অবীক্ষিত সহ রাজ্যে ফিরে এলেন রাজা করন্ধম। অবীক্ষিতের মাতা বীরা। তিনি সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন পুত্র আর পুত্রবধূর জন্য। তিনি ছুটে এলেন।

'বধূ কোথায় ?'

'পুত্রকে জিজ্ঞাসা কর, বীরা।'—গম্ভীর মুখে বললেন করন্ধম।

পুত্রকে প্রশ্ন করল বীরা, 'বধূ কোথায় ?'

অবীক্ষিত মাথা নত করে রইল।

বীরা ক্রমে ক্রমে বীরাঙ্গনা বধূর কথা শুনলেন, শুনলেন পুত্রের অবিচল প্রতিজ্ঞার কাহিনী। তাঁরও অন্তর কেঁদে উঠল। একটি রিক্তা ব্রতচারিণীর বেদনায় মথিত হল আর একটি স্নেহময়ী নারীর অন্তর। কিন্তু কি করতে পারেন তিনি ? নারী অবলা। নারীর জীবন নিরুপায়, শুধু অশ্রুময়।

তথাপি গোপনে ব্রতচারিণী বৈশালিনীর খোঁজ করলেন তিনি। দূত এসে জানাল, 'রাজকন্যা প্রাসাদ ত্যাগ করেছেন।'

'কেন ?'

'কঠিন তপস্যায় ব্রত পালনের জন্য।'

'কোথায় গিয়েছে ?'

'সে কথা কেউ বলতে পারেনি। জনশ্রুতি—গভীর নৈমিষ অরণ্যের দিকে তিনি যাত্রা করেছেন।'

বীরা নিজে বীরাঙ্গনা। বীরের রক্তে তাঁর জন্ম, পিতা বীরাগ্রগণ্য বীর্যচন্দ্র। বীরাঙ্গনার মর্ম বোঝেন তিনি। বীরাঙ্গনার জীবন কুসুম-

কোমল নয়, কণ্টকাকীর্ণ তার পথ, দুঃখ-বেদনা তার চিরসঙ্গী। বীরকে সে সহজে লাভ করতে পারে না। তার জন্য তাকে কঠিন তপশ্চরণ করতে হয়। রাজকন্যা সেই কঠিন তপে ব্রতী হয়েছে। কঠোর ব্রতে কঠিন সিদ্ধি লাভ করুক রাজনন্দিনী।

কিন্তু, কি সিদ্ধি বীর পত্নীর?—নিজের মনে ভাবেন বীরা। সুকঠিন তপশ্চর্যায় সিদ্ধি যখন করতলগত হয়, বীর যখন প্রসন্ন হন, তখনও নিশ্চিন্তে কাটে না বীরাঙ্গনার জীবন। শঙ্কা, চিন্তা, যুদ্ধের রক্তাক্ত স্বপ্ন বীরপত্নীর জীবনকে দুর্বহ করে তোলে। এই দুঃসহ দুঃখের দহনেই তার জীবন কাঞ্চনপ্রভায় ঝলমল করে। আনন্দে আতঙ্কে রুদ্র-সুন্দরের মুখ দেখে বীরাঙ্গনা।

বধূর জন্য গভীর মমতা বোধ করেন বীরা। মনে মনে প্রার্থনা করেন, ব্রতপতি তাকে সিদ্ধি দান করুন। দারুণ অস্থিরতায় দিন কাটে রাজমহিষীর।

নীতিশাস্ত্রবিশারদ মন্ত্রিগণের সঙ্গে মন্ত্রণা করেন রাজা করন্ধম। মন্ত্রিগণ বলেন, 'সীমান্তের শত্রু ক্রমে দুর্জয় হয়ে উঠছে মহারাজ!'

'শত্রুদের দমন কর।'

'সৈন্য চায় সম্রাটের সৈনাপত্য।'

'সম্রাট আজ বৃদ্ধ।'

'পুত্রকে তাহলে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করুন।'

'পুত্র সাম্রাজ্য প্রার্থনা করে না, মন্ত্রি!'

'তাহলে অনিবার্য শত্রু-সঙ্কট। মহারাজ, যৌবনে রাজ্যের প্রতি যুবরাজের বীতরাগ শুধু ঐহিক ক্ষতির কারণ নয়, আমুষ্মিক ক্ষতিরও কারণ।'

ভীত হয়ে ওঠেন ধর্মভীরু বীর করন্ধম। গভীর রাতে বিনিদ্র রজনী যাপন করেন তিনি। গবাক্ষ পথে দেখা যায় দূরের আকাশ। শূন্য

দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে থাকেন। অন্ধকার পিতৃলোকের পথ। তৃষাতুর, ক্ষুধাতুর পিতৃগণ। হাহাকার করছেন তাঁরা, ভ্রূকুটি করছেন তাঁরা, অভিশাপ দিচ্ছেন তাঁরা। অস্থির হয়ে ওঠেন করন্ধম, কণ্ঠে অস্ফুট কাতরোক্তি।

জেগে ওঠেন পত্নী বীরা, তুমি ঘুমাও নি?

রাজার চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। ভয়ে শিউরে ওঠেন বীরা। রাত্রির অন্ধকার-দর্পণে স্পষ্ট স্বামীর অন্তরাত্মার মুখ দেখতে পাচ্ছেন তিনি। কিন্তু উপায়!

একদিন পুত্র অবীক্ষিতকে ডাকলেন বীরা।

অবীক্ষিত এসে জননীর সম্মুখে দাঁড়াল। পৌরুষব্যঞ্জক দীপ্ত পুরুষ-মূর্তি। রাজপুত্র কিন্তু চীবরধারী, চাঁচর কেশে কঠিন জট। হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায় জননীর। ধৈর্য ধারণ করে তিনি বলেন, 'তুমি আমার সুযোগ্য সন্তান।'

মস্তক নত করে দাঁড়িয়ে থাকে অবীক্ষিত।

বীরা বলেন, 'তুমি বীর।'

রক্তে যেন দূর দিনের সমুদ্রগর্জন শোনে ধীর অবীক্ষিত।

'পুত্র, তুমি ধার্মিক।'

মাতার দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকায় অবীক্ষিত। মাতা বলেন, 'আমি দুষ্কর 'কিমিচ্ছক' ব্রত উদ্‌যাপন করব। তুমি আমার ব্রতের সহায় হও।'

এতক্ষণে অবীক্ষিতের মুখে ভাষা ফোটে। বিনীতভাবে সে বলে, 'মা, এ দেহ ও দেহের শক্তি তোমারই কৃপার দান। বল, কি করতে হবে আমাকে?'

বীরা বললেন, 'কিমিচ্ছক ব্রতের নিয়ম,—এ ব্রতের সহায়ককে যাচকের কিমিচ্ছা প্রদান করতে হয়।'

দীপ্তকণ্ঠে বলে অবীক্ষিত, 'আমার দেহের ও শক্তির যা সাধ্য, তোমার ব্রতে আমি অবশ্যই তা দান করব।'

স্নিগ্ধ হেসে বীরা বলেন, 'সাধ্যের অতীত মানুষের আর করণীয় কি আছে? তোমার যা সাধ্য, তাই দিয়েই তুমি আমার ব্রতের সহায়তা করবে।'

জননীকে প্রণাম করে ব্রতের উপকরণ সংগ্রহে উদ্যোগী হল বীর অবীক্ষিত। জননীর পুণ্যব্রতে পণ তার দেহ ও সামর্থ্য।

মহা সমারোহে 'কিমিচ্ছক' ব্রত আরম্ভ হল। অতি কঠিন এই ব্রত। ব্রতস্থল থেকে কেউ বিমুখ হয়ে ফিরে যেতে পারবে না। ব্রতধারিণী ও তার সহায়ক আত্মীয়গণের কাছে এ সময় যে যা ইচ্ছা করবে, তাই পূরণ করতে হবে। এ ব্রতে সিদ্ধিলাভ করতে পারে এক স্বর্গের কল্পতরু, আর মর্ত্যে কল্পতরু সদৃশ ব্যক্তি।

রাজমহিষী বীরা মরিয়া হয়েই যেন এই কঠিন ব্রত উদ্‌যাপন করলেন। ব্রাহ্মণগণ সঙ্কল্পসূক্ত উচ্চারণ করে ব্রতকর্মে ব্রতী হলেন। ঋত্বিক গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'করন্ধম-মহিষী বীরা কিমিচ্ছক ব্রত অবলম্বন করেছেন,—কে কি ইচ্ছা করছ, কার কি দুঃসাধ্য সাধন করতে হবে, বল। তিনি অবশ্যই তা পূরণ করবেন।'

উৎসাহিত হয়ে উঠল রাজপুত্র অবীক্ষিত। জননীর ব্রতে সে-ও সহায়ক। সে-ও ঘোষণা করল, 'মায়ের এই পুণ্যব্রতে আমি তাঁকে সাহায্য করব প্রতিজ্ঞা করেছি। যার যা অভিলাষ, প্রকাশ কর। সাধ্য, দুঃসাধ্য বা অসাধ্য হলেও আমি প্রাণ দিয়ে তা সাধন করতে চেষ্টা করব।'

রাজপুত্রের ঘোষণায় অর্থীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ সঞ্চারিত হল। কিমিচ্ছক ব্রতে পুত্রের ঘোষণা শুনে পুলকিতা হলেন পুণ্যবতী বীরা। আনন্দে তাঁর আনন উদ্ভাসিত হল।

ব্রতস্থলীতে অগণিত প্রার্থীর ভিড়। ইচ্ছামত কাম্য প্রার্থনা করছে হাজার লোক—গ্রাম, ভূমি, স্বর্ণ, কাঞ্চন, হেমমুদ্রা। উন্মুক্ত রাজভাণ্ডার। উদ্দীপিত অবীক্ষিত।

সহসা প্রার্থীর মত হস্ত প্রসারণ করে পুত্রের কাছে এসে দাঁড়ালেন স্বয়ং নরেন্দ্র করন্ধম, বললেন, 'পুত্র, তোমার জননীর পুণ্যব্রতে তুমি কিমিচ্ছক প্রদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছ। আমার একটি ইচ্ছা পূর্ণ কর।'

অবীক্ষিত বিস্মিত হল। নর মধ্যে যিনি নরেন্দ্র, তাঁর আবার কি প্রার্থনা? পুত্রের কাছে পিতার কি প্রার্থনা? পিতা কি সত্যি প্রার্থী?

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে অবীক্ষিত বলল, 'পিতা, আমার শরীর ও সামর্থ্য দ্বারা যা সাধ্য, আমি অবশ্যই তা সাধন করব। বলুন, কি আপনার প্রার্থনা?'

করুণকণ্ঠে বললেন বীর করন্ধম, 'আমি বৃদ্ধ। বংশের একমাত্র পুত্র তুমি, তুমিও ব্রহ্মচারী। কিন্তু বংশলোপভয়ে আমি কাতর হয়েছি। বংশক্ষয়ে ধর্মক্ষয়, পিতৃপিণ্ডলোপ মহা অনর্থের মূল। দিনে-রাতে আমি বিনিদ্র। পিতৃলোক থেকে তৃষাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন পিতৃগণ। আমি সে চোখ দেখে শিউরে উঠি।'

সত্যি শিউরে উঠলেন করন্ধম। বৃদ্ধের নয়নে স্পষ্ট আতঙ্ক চিহ্ন। কাতরস্বরে তিনি বললেন, 'পুত্র, তুমি বংশরক্ষা কর, আমায় পৌত্রমুখ দর্শন করাও। এই-ই আমার ইচ্ছা।'

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে অবীক্ষিতের। সে বলে, 'অধর্ম থেকে আমায় রক্ষা করুন, আপনি অন্য প্রার্থনা করুন। প্রতিজ্ঞা করে আমি স্ত্রী-সম্ভোগে বীতরাগ হয়েছি—আমার ধর্ম রক্ষা করুন।'

সহসা যেন জেগে ওঠেন বীর-কেশরী। তীব্রস্বরে তিনি বলেন, 'মিথ্যা অধর্মভয়ে কাতর হচ্ছ তুমি। দ্বিতীয় আশ্রমকালে চতুর্থ আশ্রমের আচরণই ধর্মবিরুদ্ধ। যে অধর্মভয়ে তুমি ভীত, গার্হস্থ্য আশ্রমে তাই-ই ধর্ম।'

স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকে অবীক্ষিত। সিংহগর্জনে বলেন করন্ধম, 'পরাজিত হয়ে যে জীবন-সংগ্রাম ত্যাগ করে, সে ভীরু। তোমার বৈরাগ্য ক্লীবোচিত, কর্তব্যভয়ে তুমি জগৎ-পলাতক। দায় থাকতেও দায়িত্ব গ্রহণে যারা পরাঙ্মুখ, তারা মানুষ নামের কলঙ্ক।'

অবীক্ষিতের বীর-সত্তায় আঘাত গভীর হয়ে বাজে। রক্তকণায় স্তিমিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেন দপ্‌ করে জ্বলে উঠতে চায়। সে ভীরু? সে মানুষ নামের কলঙ্ক?—কিন্তু উত্তর দিতে পারে না সে। পিতা বলে চলেন, 'কিমিচ্ছক ব্রতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তুমি, আমায় কিমিচ্ছা প্রদান কর। গৃহ্যসূত্র অনুসারে তুমি আমায় পৌত্রমুখ প্রদর্শন করাও। তোমার মাতারও এই ইচ্ছা।'

বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে থাকে অবীক্ষিত। কিমিচ্ছক প্রদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে সে বীতংসবদ্ধ হয়েছে। তার উভয় সঙ্কট।

পুত্রকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে এগিয়ে এলেন নিয়ম ব্রতধারিণী জননী। অপূর্ব মহীয়সী মূর্তি। প্রশান্ত বদনে স্নিগ্ধ জ্যোতি। ধীরকণ্ঠে তিনি বলেন, 'পুত্র, তোমার পিতাকে কিমিচ্ছা প্রদান কর, আমার ব্রত সার্থক কর।'

ভগ্নকণ্ঠে বলে অবীক্ষিত, 'ব্রহ্মচারী আমি—পত্নী-ত্যাগী। কেমন করে পিতার কিমিচ্ছা প্রদান করব? প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অধর্ম থেকেই বা কি করে রক্ষা পাব?'

মধুর কণ্ঠে বললেন জননী বীরা, 'তোমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হবে না, ধর্ম থেকেও ভ্রষ্ট হবে না তুমি। নৈমিষারণ্যে আছে সোনার হরিণী, বীর্য-শুল্কে সেই হরিণীকে গ্রহণ করে তুমি তোমার পিতার কিমিচ্ছা প্রদান কর।'

রুদ্ধকণ্ঠে অবীক্ষিত বলল, 'মৃগয়া দিয়ে কি করে পিতার প্রার্থনা পূর্ণ হবে?'

'সে বিচার হবে পরে'—দৃঢ়স্বরে বললেন বীরা, 'তুমি আদেশ পালন কর।'

জননীর আদেশ শিরোধার্য করে ব্রতস্থলী থেকে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বেরিয়ে এল অবীক্ষিত। রহস্যের জাল ভেদ করতে পারছে না সে। মৃগয়ার অর্থ কি বিবাহ? সোনার হরিণী কি?

লুপ্ত বুঝি অবীক্ষিতের চেতনা। লুপ্ত উৎসাহ, উদ্দীপনা। আকাশ কি ধূসর! পৃথিবী কি অকরুণ!

নিবিড় অরণ্যপথে চিন্তাকুল চিত্তে চলছে ধনুষ্পাণি অবীক্ষিত। তূণবদ্ধ তীর, পৃষ্ঠদেশে লম্বিত ধনু। অবশেষে তাকে পরাজয় স্বীকার করতে হবে। নির্লজ্জের মত নারীর পাণিগ্রহণ করবে সে। যে নারীর সমক্ষে পরাজিত হয়েছে অবীক্ষিত, সেই নারীকেই বরণ করতে হবে। কি ভাববে বিবাহিতা পত্নী? ভাববে,—স্বামী তার দুর্বল, ভীরুর পত্নী সে।

না, এ হতে পারে না। স্ত্রীর প্রাধান্য স্বীকার করতে পারে না বীর অবীক্ষিত। সে পরাজিত বটে, কিন্তু শৌর্য তার লুপ্ত হয়নি। নিজের অজ্ঞাতসারে পৃষ্ঠলম্বিত ধনু স্পর্শ করে অবীক্ষিত, তূণ থেকে একটি তীর নিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কি যেন পরীক্ষা করে। বহুদিনের অব্যবহৃত শর। অনেকদিন ধনুস্পর্শ করেনি অবীক্ষিত। কিন্তু শর সন্ধানে কি সে অক্ষম?—অক্ষম নয়। মুহূর্তে ধনুতে শর যোজনা করে সে শর সন্ধান করে। আজও অব্যর্থ সন্ধান। শরস্পর্শে আজও শিরায় শিরায় অদ্ভুত উন্মাদনা।

কিন্তু মুহূর্তেই উন্মাদনা স্তিমিত হয়ে আসে। হৃদয়ে শেলের মত বাজে পিতার কথা। সে নাকি ক্লীব! সংগ্রাম ভয়ে জগতকে ত্যাগ করেছে সে। দায়িত্ব পালনে পরাঙ্মুখ বলেই সে নাকি দায় গ্রহণ করেনি। অবীক্ষিত কি সেই কর্তব্য-বিমুখ কাপুরুষদের দলভুক্ত? পিতা কি করে মনে করলেন এমন কথা?

পিতার মুখখানি মনে পড়ে। বংশলোপভয়ে কাতর বীর। চিন্তায় বার্ধক্য নেমেছে তাঁর দেহে। পলিত কেশ, লোলিত চর্ম। কথায় কথায় অসহিষ্ণুতা। তাঁর দিকে কাতর চোখে চেয়ে আছেন পিতৃলোকের পিতৃগণ! তাই তীব্র ভৎ'সনা, তাই কাতর প্রার্থনা।

এ প্রার্থনা পূর্ণ করতে হবে অবীক্ষিতকে। মাতার কিমিচ্ছক ব্রতে পিতাকে কিমিচ্ছা প্রদান করতে হবে পৌত্র উপহার দিয়ে। এক প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, আর এক প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে হবে। যখন অবীক্ষিতের প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কথা শুনবেন, তখন কি মনে করবেন বিশাল-তনয়া? সে তাকে পতিরূপে কামনা করেছিল, তার সম্মুখে প্রতিশ্রুত হয়েছে অবীক্ষিত, সে তাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করবে না, কোন কামিনীর করস্পর্শ করবে না জীবনে। আজ যদি সেই পত্নীই গ্রহণ করতে হয়, বিশাল-নন্দিনী ব্যতীত আর কাকে গ্রহণ করবে সে?

অবীক্ষিত সেই বীরাঙ্গনার মুখখানি মনে করতে চেষ্টা করে। কি উজ্জ্বল দীপ্তি সে মুখে, কত পবিত্রতা সেই শুচিস্মিতার আননে! যেন একখানি শৌর্য-প্রতিমা! কানে বাজে সেই মধুর স্বর, 'বীর অবীক্ষিত ভিন্ন কেউ আমার পতি নয়। তিনি যদি আমায় গ্রহণ না করেন, আমি তাঁর জন্যই আজীবন তপস্যা করব। বীর্যশুল্কা আমি, আমি সতী— আমি কামিনী নই, স্বৈরিণী নই।'—কি দৃঢ় কণ্ঠ! মধুরে প্রদীপ্ত ঝঙ্কার।

এখনও কি অবীক্ষিতের জন্য তপস্যা করছেন শুচিস্মিতা?— কোথায়?—সেই বিশাল-রাজ ভবনে? রুদ্ধদ্বার কক্ষে ব্রতচারিণী বিশালতনয়ার মূর্তি কল্পনার পটে অঙ্কন করতে চেষ্টা করে অবীক্ষিত। নিমীলিত নয়নে একাগ্রমনে ধ্যান করছেন পতিংবরা ভামিনী। বীর অবীক্ষিতের জন্য তপস্যা করছেন বীরাঙ্গনা। কি ক্ষতি হত যদি অবীক্ষিত তাকে গ্রহণ করত?

অনুরাগিণী নারীর প্রেমকে অবীক্ষিত উপেক্ষা করেছে, উপেক্ষা করেছে সেই প্রেম, যে প্রেম দুর্লভ। দুঃখে যা অটল, প্রত্যাখ্যানেও যা স্থির। এ প্রেম জগতে কয়জন পায়। প্রেমিকা প্রকৃতি স্বেচ্ছায় এই মহার্ঘ রত্ন অবীক্ষিতকে দিতে চেয়েছিল। দাম্ভিক অবীক্ষিত, বুদ্ধিভ্রান্ত অবীক্ষিত সে রত্নকে হেলায় ত্যাগ করেছে। তাই বুঝি ব্যথাহতা নারীর দীর্ঘশ্বাস আজ ভীষণ প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হয়েছে। চামুণ্ডা আজ প্রেমিকা প্রকৃতি।

দ্বিপ্রহরের বনপ্রকৃতির দিকে তাকায় অবীক্ষিত। কে যেন অগ্নিবৃষ্টি করছে,—প্রত্যাখ্যাতা নারীর অশ্রু-বহ্নি; কে যেন ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টি মেলেছে,—উপেক্ষিতা নারীর ভ্রূভঙ্গ। বিরাট বনস্পতি দগ্ধ, স্তব্ধ।

দগ্ধ, স্তব্ধ অবীক্ষিত। এর চেয়ে বড় পরাজয় কিছু নেই। কিমিচ্ছক তাকে প্রদান করতেই হবে। অবীক্ষিতের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে। সে প্রতিজ্ঞাভঙ্গে শ্লেষহাসি হাসবে বিশাল-নন্দিনী, বলবে, ওরে ভীরু, এই তোমার প্রতিজ্ঞা! কামনার দাস তুমি, ব্রহ্মচর্য ভান। চিরকালের প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী পুরুষ।

অবীক্ষিতের মাথায় আগুন জ্বলে,—আগ্নেয়গিরি বিদীর্ণ হয়েছে। পতিব্রতা ভামিনী ব্যতীত আর কাউকে সে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে পারে না। হয় ভামিনী আসুন, নয় কোন ঔষধ দিয়ে পাগল করে দেওয়া হক তাকে। বুদ্ধির ওপর তখন শাসন থাকবে না অবীক্ষিতের। তখন তাকে দিয়ে যা খুশী, তাই করিয়ে নেওয়া হক। কেউ সমালোচনা করবে না। অবীক্ষিতকেও সে সমালোচনায় বিচলিত হতে হবে না।

চিন্তার গভীরে ডুব দিয়েছে অবীক্ষিত, ভুলে গিয়েছে গভীর বনে বিপদ থাকতে পারে। অরণ্যে চিরজাগ্রত আরণ্য স্বভাব—এ বোধ পর্যন্ত নেই। সহসা সেই গভীর বন কাঁপিয়ে ওঠে এক ভয়ার্তা নারীর কাতর কণ্ঠ, 'রক্ষা কর, কে আছ, আমায় রক্ষা কর।'

নারীর করুণ কণ্ঠ ছাপিয়ে উঠল খলখল হাসি। দুর্বিনীত কণ্ঠ মদবিহ্বল স্বরে বলল, 'বৃথা চিৎকার, এখানে রক্ষাকর্তা কেউ নেই। আমি দনুপুত্র দানব দৃঢ়কেশ, আমাকে কেউ বাধা দিতে পারে না। এই আমি তোমায় নিজ বাহুবলে হরণ করছি।'

নারীকণ্ঠে জাগল তীব্র ভর্ৎসনা, 'ওরে পশু, আমায় স্পর্শ করিস্‌নে। অগ্নিশিখা স্পর্শের ফল অনিবার্য মৃত্যু।'

'অগ্নিশিখা!'—বিকৃত কণ্ঠে কদর্য শ্লেষ, 'কোন্ গার্হপত্য অগ্নির শিখা তুমি সুন্দরী!' জ্বলে ওঠে নারীকণ্ঠ, 'করন্ধম-পুত্র বীর অবীক্ষিতের

পাণিগৃহীতা আমি। তাঁর বীর্যভয়ে যম ভীত হয়। তিনি যখন তোর এই দুষ্কর্মের কথা শুনবেন, তখনকার পরিণাম অতি ভীষণ।'

সচকিত হয়ে উঠল বীর অবীক্ষিত। বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। একে নারীহরণের এই ঘটনা, তার ওপর নারীর এই উক্তি। অবীক্ষিত অবিবাহিত, তার ভার্যা কোথা থেকে আসবে? সজ্ঞানে সে কারো পাণিগ্রহণ করেনি।

উদ্যত ধনুহস্তে স্বর লক্ষ্য করে দ্রুত অগ্রসর হল বীরা-পুত্র। প্রথম প্রয়োজন দুষ্কর্মকারীর শাস্তি ও অসহায়া নারীর উদ্ধার।

একটু অগ্রসর হয়েই সে দেখল, একটি কম্পিতা কৃশাঙ্গীকে দৃঢ়হস্তে ধারণ করে সবেগে ছুটছে দনুপুত্র দৃঢ়কেশ। অতি ভীষণ তার মূর্তি, কামপীড়ায় আরও উগ্র আকার ধারণ করেছে সে। আর তারই কবলে আর্তা কুররীর মত 'ত্রাহি ত্রাহি' রবে ক্রন্দন করছে বরাঙ্গনা। করুণ ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত বনতল।

মুহূর্তে প্রদীপ্ত কণ্ঠে বলল অবীক্ষিত, 'ভয় নেই, ভয় নেই। এইক্ষণেই দুর্বৃত্তকে শাস্তি দিচ্ছি আমি। আমি ক্ষত্রিয়, আর্তরক্ষার জন্যই আমার অস্ত্র-দীক্ষা।' তারপর দুর্মতি দানবকে লক্ষ্য করে বজ্র-গর্জনে বলল, 'ওরে পশু, যদি প্রাণের মমতা থাকে, শীঘ্র এ কন্যাকে ত্যাগ কর।'

দৃঢ়কেশ কন্যাকে ত্যাগ করল বটে, কিন্তু দণ্ডহস্তে সবেগে অবীক্ষিতের দিকে অগ্রসর হল। নিমেষে শরসন্ধান করল অবীক্ষিত। ভীমদণ্ড হস্তচ্যুত হল। গর্জন করে উঠল দানব দৃঢ়কেশ, আঘাতে উন্মত্ত বন্য মাতঙ্গ। চোখের পলকে একটি বৃক্ষ উৎপাটন করে ভীমবেগে রাজপুত্রের দিকে নিক্ষেপ করল সে। কিন্তু অর্ধপথেই প্রতিহত হল উৎপাটিত বৃক্ষ। ক্রুদ্ধ দানব এবার জ্ঞানহারা উন্মাদের মত ঝটিকা-বেগে অগ্রসর হল। মর্মর করে উঠল শুষ্ক পত্র, পদচাপে ভূমিকম্প শুরু হল। অবিলম্বে বেতসপত্র বাণ সন্ধান করল ধানুকী অবীক্ষিত। অব্যর্থ শরসন্ধান। হুঙ্কার করে আক্রমণ করার পূর্বেই বীর অবীক্ষিতের

প্রচণ্ড শরাঘাতে নিহত হল দুর্বৃত্ত দানব। তার বিশাল প্রাণহীন দেহ সশব্দে ভূতলে পতিত হল, যেন ভূতলে পতিত হল উৎপাটিত ভূধর।

এগিয়ে এল অবীক্ষিত। বেতসীলতার মত কাঁপছে কৃশাঙ্গী কন্যা, চেলাঞ্চলে দেহ ও বদন আবৃত করে অঝোর ধারায় কাঁদছে সে।

অবীক্ষিত বলল, 'ভয় নেই, দানব নিহত হয়েছে। কিন্তু, কে আপনি? এই নির্জন অরণ্যে কেনই বা এসেছেন? আপনি আপনাকে করন্ধম-পুত্র অবীক্ষিতের ভার্যা বলেই বা পরিচয় দিলেন কেন?'

অজস্র প্রশ্নের ঝড়। কিন্তু নীরব ব্রীড়াবনতা নারী। বসনে বদন আবৃত করে তেমনি অঝোর ধারায় কাঁদছে সে। মুক্ত যেন পাহাড়ী ঝর্ণা, সে ঝরে, শুধু ঝরে।

অস্থির ভাবে প্রশ্ন করে অবীক্ষিত, 'উত্তর দিন, আপনার এ উক্তির অর্থ কি? অবীক্ষিতকে কি চেনেন আপনি? অবীক্ষিতকে কখনো দেখেছেন?'

আন্দোলিতা হিমনিকরে ঢাকা কমলিনী। ফোটে কি ফোটে না। কত দুঃখে আঁধার রাতে প্রতীক্ষা করে সে। দয়িত তার সূর্য, সূর্য তার ধ্যানের ধন। প্রতীক্ষা-রাত্রির অবসানে যখন সূর্য আসে, যদি কমলিনীকে দেখেও চিনতে না পারে—কি গভীর বেদনা বাজে পদ্মিনীর বুকে। লজ্জা বেদনা, নীরব বিলাপ। নিজের মনে গুমরে মরে কমলিনী।

অবীক্ষিতের প্রশ্নে তেমনি সঙ্কুচিতা কমলিনী। ক্ষণেক সে নীরব থাকে। তেমনি বসনে বদন আবৃত করে অশ্রু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, 'পুরুষ নারীকে ভুলে যায় কুমার, কিন্তু বারেকের দৃষ্টিতে নারী যাকে চিনে নেয়, সারা জীবনেও তাকে ভুলতে পারে না। নারীর মনোমুকুরে অক্ষয় পলকের প্রতিবিম্ব। আপনিই বীর করন্ধম-পুত্র অবীক্ষিত।'

আহত হয় অবীক্ষিত। নারীর উক্তি যেন ব্রহ্মচারী অবীক্ষিতের প্রতি এক তির্যক কটাক্ষ। অবীক্ষিত অবিবাহিত, অবীক্ষিত ব্রহ্মচারী। স্বপ্নেও সে কখনো কোন নারীকে আত্মদান করেনি। উতলা মাধবী রাতে, যখন প্রগল্‌ভ হয়ে উঠেছে প্রকৃতি, অবীক্ষিত প্রাণপণে দমন

করেছে তাকে। কত ফুল ইসারায় ডেকেছে, কত ফুল স্বেচ্ছায় পাঁপড়ি মেলে ধরেছে, কিন্তু অনঙ্গবলে অবীক্ষিত অন্ধ প্রজাপতি। অবীক্ষিতের দুর্জয় প্রতিজ্ঞা। সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেনি, করে না।

প্রাণপণে সে স্মৃতিকে মন্থন করে। কিছুই স্মরণ করতে পারে না। সে যেন উত্তেজিত হয়ে ওঠে, উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, 'আমি কোন নারীকে পত্নিত্বে বরণ করিনি।'

'আপনি করেননি। কিন্তু সে নারী আপনাকেই মনেপ্রাণে পতি বলে বরণ করেছে। দিবসে নিশীথে আপনারই ধ্যান করছে।'

'এমন নারী যদি কেউ থাকেন, তিনি বিশাল-রাজনন্দিনী ভামিনী। তিনিই আমাকে পতিরূপে বরণ করতে চেয়েছিলেন, আমারই জন্য সকল সুখ বিসর্জন দিয়েছিলেন। নৃশংসের মত আমি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। কিন্তু অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস, আজ তাঁকেই আমার বিশেষ প্রয়োজন।'

'প্রয়োজন কেন? আপনি তো কোন নারীকে অভিলাষ করেন না।'

ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে অবীক্ষিত, 'মাতার কিমিচ্ছক ব্রতের সুযোগ নিয়ে পিতা প্রার্থনা করেছেন, আমি তাঁকে যোগ্য পৌত্র প্রদান করি। আমার নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেও পিতার প্রার্থনা পূর্ণ করতে হবে। কিন্তু যিনি আমাকে মনে প্রাণে প্রার্থনা করেছেন, তাঁকে ছাড়া অন্য নারীকে কেমন করে গ্রহণ করব আমি?—সে বিশাল-নন্দিনী কি আর বেঁচে আছেন? সে সুভ্রূ সুনেত্রা নিশ্চয় আমার ধ্যান করতে করতে প্রাণ বিসর্জন করেছেন।'

অবীক্ষিতের কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হয়ে আসে, রুদ্ধস্বরে সে বলে, 'অথচ আমার এই মানসিক অবস্থায় আপনি বলছেন, আপনি অবীক্ষিতের ভার্যা। শুনেছি, বনে থাকে মায়াবিনী নারী। আপনি কি সেই অরণ্য-মায়া?'

উন্মুখ নারী হৃদয়। মন-সাগরে উত্তাল আশা-তরঙ্গের দোল। বীতরাগ বীর আজ নারীতে অভিলাষী। আবৃত নয়নে ভাসে মধুর

স্বপন। ব্রত কি সমাপ্ত হল এতদিনে? ব্রতপতি কি মুখ তুলে তাকালেন?

নিজেকে এতক্ষণ প্রকাশ করেনি তন্বঙ্গী। শুধু সঙ্কোচ নয়, ছিল আশঙ্কা। মেঘে ঢাকা চাঁদে প্রকাশের বাসনা ছিল, কিন্তু বাধাও ছিল অনেক। বীরের প্রতিজ্ঞাকে জানে বীরাঙ্গনা। প্রাণের বিনিময়েও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না বীর। আজ বুঝি হৃদয়ের টানে হৃদয় জেগেছে, প্রেমের টানে জেগেছে প্রেম।

স্বপ্ন-বিভোরার মত উঠে দাঁড়ায় কৃশাঙ্গী। বসন সম্বৃত করে আয়ত চোখে তাকায় কুমারের পানে, যেন নতুন প্রভাতে বিরহিণী কমলিনী অভিনন্দন করছে প্রিয়তম সূর্যকে। নিমেষহারা নয়ন।

বিস্ময়ে চিৎকার করে ওঠে অবীক্ষিত, 'একি! কে তুমি! কে তুমি!'

অশ্রু-সজল স্বরে বলে ভামিনী, 'আমিই সেই প্রত্যাখ্যাতা হৃত-ভাগিনী।'

'হৃত ভাগিনী নও, তুমি কল্যাণী সুভগা! বীর্যশুল্ক দিতে না পেরে একদিন লজ্জায় পরিত্যাগ করেছিলাম তোমাকে। আজ আমার লজ্জা নেই, বীর্যশুল্কেই আজ তোমায় লাভ করেছি। যে হাতে দানব নিহত হয়েছে সেই হাতেই তোমার পাণিগ্রহণ করছি আমি। তোমার তপস্যাই আমাকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পাপ থেকে রক্ষা করেছে। বীর্যশুল্কা সুভগা, তুমি মাতার কিমিচ্ছক ব্রত প্রতিষ্ঠার সহায়িনী হও।'

এগিয়ে আসে আনন্দোৎফুল্ল বীর অবীক্ষিত, নয়নে প্রণয়-দীপ্তি। তখন মলদিগ্ধাঙ্গী সোনার হরিণীর নয়ন বেয়ে ধারাসারে অশ্রু নেমেছে—হাজার মুক্তার লহর। বীরের অনঙ্গ-সঙ্কেতে রোমাঞ্চিতা বীর্যশুল্কা।

॥ দুঃসাহসিকা ॥

দুঃসাহসে ভর করে মানুষ আকাশ-অভিযান করে, মেরু-শিখরে যাত্রা করে, অজানা নদীর উৎস খোঁজে। কেন? কি সে পায়? —কখনো ব্যর্থতা, কখনো মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ। তবু দুঃসাহসিক অভিযানের শেষ নেই। সফলতা-অফলতা নয়, আনন্দই অভিযানের চরম প্রাপ্তি। মৃত্যুর ফেনিল মুখে দুঃসাহসের রোমাঞ্চ মহার্ঘ রত্ন।

এই দুঃসাহসের সমাদর সর্বাধিক প্রেমের রাজ্যে। রূপকথার যুগ থেকে শুরু করে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের সীমা পেরিয়ে যুগে যুগে তার অভিযান। চারুকলা, কবির কাব্য, শিল্পীর চিত্র তার স্বাক্ষর। চঞ্চল প্রেম বন্ধন মানেনি, শাসন মানেনি। অনিরুদ্ধ তার বেগ, ঝড়ের রাশ ধরে তার যাত্রা।

এমনি এক দুঃসাহসিক অভিযাত্রার কাহিনী পৌরাণিক যুগের সুলোচনার প্রেম।

দীব্যন্তী পুরীর রাজার একমাত্র সন্তান সুলোচনা। রাজার ইচ্ছা, তাকে পুত্রিকা করে রাখেন। পুত্রের মত তাই তিনি পুত্রীকে পালন করেছেন। পুরুষের মত শিক্ষা সুলোচনার। শস্ত্রে ও শাস্ত্রে সে সু-নিপুণা, অশ্বারোহণে সে পারদর্শীনী। তার কাছে জীবন এক

রোমাঞ্চকর স্বপ্ন। বাধা ও বিপদের মুখে ঘোড়া ছুটিয়ে সে সুখ পায়। আনন্দ তার দুঃসাহসে, বিঘ্নবরণে ও বিঘ্নজয়ে।

দেহভরা ঢলঢল যৌবন, যেন কানায় কানায় ভরা পাহাড়ী ঝর্ণা। সে যৌবন-মত্ততায় কন্দর্প প্রশ্রয় পায় না। উদ্দাম, দুরন্ত বেগের মুখে ছোট ছোট উপল কোথায় ভেসে যায়, পাথর পর্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ। কলকল খলখল হাসে পাগলী মেয়ে।

'কঞ্চুলি আর শাসন মানে না সখী?'—হেসে বলে ইন্দুলেখা।

'নিতম্বভারে তোমার গতি মন্থর হয়েছে।'—বলে মঞ্জরী সই। নিজের দেহের দিকে তাকায় রাজকুমারী সুলোচনা। কোন্ ফাঁকে বঙ্কিম ভঙ্গি চুরি করে শিখে নিয়েছে নয়ন। বাঁকা হেসে সে বলে, 'যৌবন-বনে প্রজাপতি তো এল না সই, না একটি ভ্রমর।'

'প্রজাপতি ভ্রমরের আনাগোনা কি দেখনি তুমি?'

'কোথায়?'

'সুলোচনা-মৌ-বনের খুব কাছে।'

'কারা তারা?'

'কেন, মৎস্যকুমার, মীনাক্ষ, ত্রিবিক্রম-পুত্র বিদ্যাধর?'

হো-হো করে হেসে ফেটে পড়ে সুলোচনা, দেহের রেখায় রেখায় তির্যক শ্লেষ, 'ও, সেই মিনমিনে মীনাক্ষ, বিরলকেশ বিনীত বিদ্যাধর।'

অশ্বে আরোহণ করে বিদ্যুৎবেগে বনপথে মিলিয়ে যায় যৌবন-মত্তা।

সেই সুলোচনার কি হল! সেদিন ভোর হতে না হতেই দ্রুত অশ্বারোহণে সে চলল সখী চন্দ্রকলার গৃহের দিকে। আকাশে প্রথম প্রভাত-রাগ। অরুণ-স্পর্শে রক্তমুখী ঊষা। কে যেন আবির ছড়িয়েছে বনতলে। সুলোচনা তাকিয়ে দেখল। দ্রুততর হল অশ্ববেগ।

অদ্ভুত এক কাহিনী শুনিয়েছে সখী চন্দ্রকলা। কথায় রূপকথার রোমাঞ্চ। রক্তে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে সুলোচনার।

সারা রাত কেটেছে এক অস্থির মধুর স্বপ্নে। সে স্বপ্নে কেঁপে

কেঁপে উঠেছে দূর আকাশের তারা। গ্রহে গ্রহে গ্রহ-কম্প। পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে অসীম শূন্যে বিপুলবেগে ছুটেছে সুলোচনা।

তাল-ধ্বজ পুরীর রাজপুত্র মাধব। অপরূপ তার রূপ, অনির্বচনীয় মাধুর্য। দেহে আশ্চর্য বীরত্ব ব্যঞ্জনা।

অস্থির হয়ে উঠেছে সুলোচনা। তার কাহিনী শুনেও তৃপ্তি হয়নি। তাই ছুটে চলেছে চন্দ্রকলার গৃহে। যেন দূরান্তরের সূর্যপ্রভা উতল করে তুলেছ সুদূর লোকের কমলিনীকে। যত শুনছে তত শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে,—কেমন সে কুমার, নয়নে যার সূর্যদীপ্তি, বাহুতে যার মত্তহস্তীর বল ?

অশ্ব এসে থামল সখী চন্দ্রকলার গৃহাঙ্গনে। রশ্মি সংযত করে ব্যগ্রস্বরে ডাকল সুলোচনা, 'চন্দ্রকলা !'

ছুটে এল সখী চন্দ্রকলা, হেসে শুধাল, 'একি ! প্রভাতে দেখছি চন্দ্রোদয় !' অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নামল সুলোচনা। রশ্মি ছেড়ে দিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়াল অশ্বপৃষ্ঠে হেলান দিয়ে। প্রথম প্রভাতের অরুণরাগে ঝলমল আনন। অন্তরের রাগ বুঝি যুক্ত হয়েছে অরুণরাগের সঙ্গে। একটু সঙ্কোচ, একটু দ্বিধা। জড়িতস্বরে সে বলল, 'কত দেশ ঘুরে এল সখী, কত বিচিত্র কাহিনী তার মুখে। সে কাহিনী শুনতে কার না ইচ্ছা হয় ?'

চন্দ্রকলা হাসল, সাদা মেঘের ফাঁকে চাঁদের চাপা হাসি। বলল, 'বটেই তো। তা সখী কি বাইরে দাঁড়িয়েই রূপকথা শুনবে ?'

'বাইরের কথা বাইরে দাঁড়িয়েই শুনে সুখ।'

'সখীকে ঘরছাড়া করেছে নাকি ?'

''সুন্দরের ডাক চিরকাল ঘর ভুলায়, বিশেষত সে সুন্দর যদি বীর হন।'

'আর বিশেষ করে ভোলে সেই সব সুন্দরী, যারা বীরাঙ্গনা।'

কৌতুকে দীপ্ত হয়ে ওঠে সখী চন্দ্রকলা। আরক্ত হয় সুলোচনা। নতুন প্রভাতের নতুন রাগে নতুন দেখায় সুলোচনাকে। এ যেন সে

স্থলোচনা নয়, মদনশরকে যে কশাঘাত করে, কন্দর্পকে যে উপেক্ষা করে উচ্ছল হাসিতে।

চন্দ্রকলা মিটি মিটি হাসে, তারপর মিঠিয়ে মিঠিয়ে বলে, 'আমি শপথ করে বলতে পারি, এমন পুরুষরত্ন ত্রিভুবনে নেই। বীর-অঙ্গে নব যৌবন-মাধুরী। নিশ্চয় তিনি শাপভ্রষ্ট দেবতা, নয় কোন গন্ধর্ব।'

কণ্ঠে মধু ক্ষরে চন্দ্রকলার, যেন চন্দ্রসুধা। উন্মুখ চিত্তে কথামৃত পান করে স্থলোচনা, যেন কৌমুদী-স্নাতা কুমুদিনী।

চন্দ্রকলা বলে, 'সে রূপ চোখে না দেখলে বোঝানো অসম্ভব। সেদিন সরোবরে গিয়েছিলাম ঘটভরণে, সূর্যের শেষ আলোতে দেখলাম সেই রূপ, যেন অস্তসাগরতীরে নতুন সূর্যোদয়। আবিষ্ট নয়নে চেয়ে রইলেন তিনি। আমার অঙ্গে রোমাঞ্চ খেলে গেল, ভয়ে শিউরে উঠলাম। তিনি প্রশ্ন করলেন, তুমি কে? কোন দেশের নাগরী। ভয়ে ভয়ে উত্তর করলাম আমি, 'আমি প্লক্ষদ্বীপের দীব্যন্তী পুরীর রাজকন্যা সুলোচনার সখী। 'সুলোচনা'—নাম শুনে চমকে উঠলেন তিনি, বিহ্বল কণ্ঠে বললেন, তার নয়ন বুঝি খুব সুন্দর? আমি বললাম, শুধু নয়ন নয়, দেহের যে-কোন অঙ্গ। আপনি যেমন রূপবান, আমাদের রাজকন্যাও তেমনি রূপবতী। উদাসকণ্ঠে তিনি বললেন, সে রূপ নিশ্চয় কোন ভাগ্যবান রূপকুমারের ভোগে সার্থক হয়েছে। আমি হেসে বললাম, তা কেমন করে হবে। কৌমারহর কোন বীরকুমার তো এখনও তার পাণি পীড়ন করেন নি? যোগ্যের জন্যই প্রতীক্ষা করছে আমাদের সখী।'

ব্যাকুল সুলোচনা। তৃষাতুর দৃষ্টি, কম্পিত ওষ্ঠাধর। ব্যাকুলভাবে সে বলে, 'তিনি কি বললেন?'

বললেন, 'আমি জানি না, কোথায় সে দেশ, কেমন করেই বা যেতে হয় সেখানে। আমি বললাম, ক্ষীরোদ সাগরে বেষ্টিত প্লক্ষদ্বীপ অতি দুর্গম। সে দ্বীপে যে কেউ যেতে পারে না। যাঁরা বীর, যাঁরা উদ্যোগী, তাঁরাই শুধু সেখানে যেতে পারেন। পদব্রজে সে দেশে

যাওয়া যায় না, শিক্ষিত বেগবান্ অশ্বই সে দুর্গম পথ অতিক্রম করতে পারে। শুনে রাজপুত্রের নয়নে শৌর্য বহ্নি জ্বলে উঠল, যেন প্রদীপ্ত স্বর্ণভানু। দীপ্তস্বরে তিনি বললেন, কে না জানে ভুবন বিজয়ী তালধ্বজ পুরীর রাজপুত্র মাধব! আমার অশ্বশালায় এমন সৈন্ধব আছে, যা সশৈল সাগরদ্বীপ অতিক্রম করতে পারে। কিন্তু আমার ভয়—দীব্যন্তী পুরীর সুলোচনা আমার মত অযোগ্যকে বরণ করবেন কেন?'

'তুই কি বললি?'—শুধায় সুলোচনা।

'আমি বললাম, বীরাঙ্গনা চিরকাল বীরকেই কামনা করে, সূর্যমুখীর অন্তরে নিরন্তর সূর্যের ধ্যান। আমাদের সখী বীরাষ্টমী ব্রত করে রাখী হাতে বেঁধেছে, সঙ্কল্প করেছে, যোগ্য বীরের সঙ্গেই রাখী বিনিময় করবে সে।'

একটু থামল চন্দ্রকলা। অস্থির হয়ে উঠল সুলোচনা। নিশ্বাস ফেলারও অবসর দিতে চায় না চন্দ্রকলাকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে 'তারপর?'

কৌতুক হেসে চন্দ্রকলা বলল, 'সঙ্কেতে আমি আমন্ত্রণ জানালাম, বললাম, উদ্যোগী পুরুষই লক্ষ্মীলাভে সমর্থ হন। লক্ষ্মী চঞ্চলা, দীর্ঘকাল একস্থানে প্রতীক্ষা করেন না। যৌবনপুষ্পে মধুকরের অভাব কি? শুভকার্যে বিলম্ব করা অনুচিত। রাজপুত্রের স্বর্ণ-চূর্ণ দেহে বিদ্যুৎ চমক খেলে গেল। আরক্ত কপাল-কপোল। শূরত্বে অপূর্ব স্মরচিহ্ন। উৎফুল্ল হয়ে তিনি বললেন, কমলিনীকে প্রতীক্ষা করতে বল। তিনি অচিরাৎ সূর্যের সাক্ষাৎ পাবেন।

রোমাঞ্চ স্বাদে রোমাঞ্চিত তনু দেহ। রাজকন্যা সুলোচনার রক্ত-কণায় অদ্ভুত শিহরণ। বীর্যবতীর অঙ্গ যেন স্নেহে নবনীতসম কোমল হয়ে ওঠে। শিথিলবর্ম অশ্বদেহে পরম সোহাগে সে হাত বুলাতে থাকে। অসম সাহসী সুলোচনার মন দুঃসাহসে ভর করে যেন কোন্ দিগন্তে উধাও হয়ে যায়।

সহসা ছুটে আসে দূতী, 'রাজকন্যা আপনি এখানে? সবাই আপনাকে খুঁজছে।'

'কেন ?'

'কেন ? আপনার বিবাহ স্থির হয়ে গেল !'

'বিবাহ ! কার সঙ্গে ?'

'রাজপুত্র বিদ্যাধর। স্বয়ং রাজা এ প্রস্তাব সমর্থন করেছেন। বিবাহের দিনও স্থির হয়েছে।'

রোষে জ্বলে ওঠে রাজকন্যা, 'কে ? বিদ্যাধর ? সেই অপদার্থ সুপুরুষ ?'

ভয়ে ভয়ে বলে চন্দ্রকলা, 'বিদ্যাধর !'

ক্ষুব্ধ আক্রোশে ওষ্ঠাধর দংশন করে সুলোচনা। নয়নে বিদ্যুৎ-বহ্নি খেলতে থাকে। বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, 'পিতার সর্তে সম্মত হওয়া তার মত কাপুরুষের পক্ষেই সম্ভব।

সুলোচনা জানে, পিতা তাকে পুত্রিকা করে রাখতে চান। পুত্রিকা করে রাখার তাৎপর্য, পুত্রীই হবে পুত্রতুল্য—স্বামী হবে গৃহ-জামাতা। শ্বশুরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে জামাতাকে। শুধু তাই নয়, স্বামীর ঔরসে সুলোচনার যে সন্তান হবে, সে সন্তানেরও অধিকার ছেড়ে দিতে হবে পিতাকে। কোন জননী এতে সম্মত হতে পারে ? কোন বীর্যবান পিতাই কি রাজি হতে পারে এই হীন প্রস্তাবে ? ভীরু, ক্লীব বিদ্যাধর। তাই এই হীন প্রস্তাবে সম্মত হয়েছে সে।

বিদ্যাধরকে চেনে সুলোচনা। সুদর্শন বিনীত যুবক। কথা বলতে বলতে অযথা দোল্ খায়। যৌবনে অকাল বার্ধক্য তার। সে কামনা করে নিষ্প্রাণ শান্তি। পৌরুষ বর্জিত পুরুষ, আকাশে মেঘ দেখে যে ভয় পায়, ঝড় উঠলে সভয়ে গৃহকোণে আশ্রয় নেয়। এই ব্যক্তি বর হবে বীরাঙ্গনা সুলোচনার ?

অস্থির হয়ে ওঠে বীর্যবতী। শান্ত-শিষ্টের জীবন তার নয়, আশৈশব স্বাধীন সে, পুরুষের মত স্বাধীন। পিতাই তাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। পুরুষের মত অস্ত্রচালনায় সে সুদক্ষ, অশ্বচালনায় নিপুণ। সশৈল সাগর-মেখলা প্লক্ষদ্বীপে তার জন্ম। জন্মাবধি বন, পাহাড়, সমুদ্রের সহচরী সে। তার ঘোড়ার খুরের খরধ্বনিতে বন সচকিত

হয়, পাহাড় প্রতিধ্বনিতে আর্তনাদ করে ওঠে। আকাশে মেঘ করে আসে, ঘনঘোর ডম্বর। দুরন্ত ঝটিকার বেগে পাগল হয় বন, পাগল হয় সাগর। আতঙ্কে চোখ বোজে দীব্যন্তী পুরীর অধিবাসী। সেই সময় মত্ত ঘোড়ায় চাবুক মেরে বনপথে বেরিয়ে পড়ে সুলোচনা। ভয়ার্ত সখীদের নিষেধবাণী মিলিয়ে যায় ঝড়ের শব্দে। ঝঞ্ঝা-জলে হাসে বীরাঙ্গনা কন্যা। কখনো বা সে উন্মাদ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে, উত্তুঙ্গ তরঙ্গশীর্ষে সওয়ার হয়ে বসে। বাধা-বিপদের মুখে আনন্দ খুঁজে বেড়ায় সে। তার জীবন রোমাঞ্চময় স্বপ্ন। সেই বীরবালার বর হবে ভীরু বিদ্যাধর !

মাথায় আগুন জ্বলে সুলোচনার। সভয়ে চন্দ্রকলা বলে, 'কি হবে তাহলে ? পিতার আদেশ লঙ্ঘন করা অন্যায়।'

জ্বলে ওঠে সুলোচনা, 'ন্যায় কি শুধু পুতুলের মত পুত্রিকা সেজে থাকা ? পিতার কি উচিত ছিল না কন্যার মতামত গ্রহণ করা ?'

তার একবার ক্রোধ হয় বিদেশী রাজপুত্র মাধবের ওপর। তিনি আসছেন না কেন ? বেগবান অশ্বে আরোহণ করে বীর্যশুল্কে হরণ করছেন না কেন বীরাঙ্গনাকে ? পরক্ষণেই সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ে বিদ্যাধরের ওপর। সে বীর নয়, বুদ্ধিও কি তার নেই ? আভাসে-ইঙ্গিতে সুলোচনার বিরাগের পরিচয় কি সে পায়নি ? মূর্খ বলেই বিমুখী প্রণয়িনীর প্রতি তার প্রণয়। পিতা হয়ে যে নিজ সন্তানের অধিকার ছেড়ে দিতে সম্মত হয়, সে কি মানুষ ? সুলোচনা তাকে ঘৃণা করে।

কিন্তু, পিতা ?

হাতের কশা আস্ফালন করতে থাকে সুলোচনা। নিমেষে অশ্ববল্গা ধারণ করে সে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে। তীব্র কশাঘাত করে অশ্বে। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত অশ্ব লাফিয়ে ওঠে, তারপর অতি দ্রুতবেগে খুরের আঘাতে ধূলিচূর্ণ উড়িয়ে পলকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

মাথার ওপর সূর্যের খর উত্তাপ। উত্তপ্ত অশ্ব, তার চেয়েও উত্তপ্ত অশ্বারোহিণী নিজে। সর্বাঙ্গে তীব্র জ্বালা।

ঝড়ের বেগে ওড়ে বেণীকুন্তল!

অবাক মুখে দাঁড়িয়ে থাকে সখী চন্দ্রকলা আর রাজকন্যার দূতী। দূতী বলে, 'বিদ্যাধরের কথায় রাজকন্যা এমন করলেন কেন?'

'রাজকন্যা বীর মাধবকে ভালবাসেন।'

'মাধব! মাধব কে?'

'তালধ্বজ পুরীর রাজপুত্র। অনেক দূরে তাঁর দেশ।'

'তাঁর কথা রাজকন্যাকে কে শোনাল?'

'আমি।'

দূতী বয়সে বড়। চন্দ্রকলাকে সে বলে, 'রাজকন্যাকে বীর মাধবের কাহিনী শোনানো তোমার উচিত হয়নি। আগুন দিয়ে আগুন জ্বালিয়েছ। এ আগুনে রাজকন্যা নিজেও দগ্ধ হতে পারেন। রাজপুত্র মাধব এলেও বিপদ, না এলেও বিপদ ঘটবে।'

সত্যি বিপদ সূচিত হল। রাজার নির্দেশে গন্ধাধিবাসের দিন স্থির হল। সেদিন দীব্যন্তী পুরীতে আনন্দোৎসবের ঘটা। সুসজ্জিত রাজপুরী, মাঙ্গল্যে চিহ্নিত রাজপ্রাসাদ, রাজপথ। ভারে ভারে আসছে বরপক্ষের উপঢৌকন।

কিন্তু রণচণ্ডীর মূর্তি ধারণ করেছে রাজকন্যা সুলোচনা। অন্তর্দ্বন্দ্বে অস্থির সে। একদিকে বিদ্যাধর, অপরদিকে রাজপুত্র মাধবের চিন্তা; মাঝখানে পিতার নির্দেশ। বিদ্যাধর চেনা, মাধব অচেনা। অচেনার প্রতিই সুলোচনার প্রীতি। অজানাকে সে জানতে চায়। রহস্যের রাজ্য উদঘাটন করতে চায় সে। কল্পলোক তার প্রিয়।

বরপক্ষের উপঢৌকন বিষবৎ মনে হয়। কেয়ূর, কঙ্কণ, হারে যেন তীব্র বিষের জ্বালা। বিদ্যাধরের প্রগল্‌ভতা তাকে কঠিন করে তোলে। চন্দ্রসুধায় বায়সের লোভ? কি যোগ্যতা আছে বিদ্যাধরের? বিদ্যাধর সুপুরুষ বটে, কিন্তু মাকাল ফল। নিঃসার সৌন্দর্য। সদ্‌গুণ যাই

থাক, সুলোচনা তাকে কামনা করে না। ভীরুকে ঘৃণা করে বীরাঙ্গনা। বিদ্যাধর একথা জানে। সুলোচনা স্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়ে দিয়েছে তাকে।

সেদিন নটিনী ঝর্ণার মত উদ্যানপথে ছুটে চলেছিল সুলোচনা। হঠাৎ থেমে দাঁড়াল। কে? দেখল লালসাজড়িত চোখে তাকিয়ে আছে লোলুপ বিদ্যাধর।

'তুমি এখানে কেন?'

'না, এই এমনি।'

'রাজবালাদের রূপে বড় মাদকতা, তাই না? দেহে তাদের সুরা, চোখে সোমরস।'

দোল্ খেতে থাকে বিদ্যাধর। মুখের কোণে বোকার হাসি। বজ্র বিদীর্ণ হয় সুলোচনার কণ্ঠে, 'তুমি জান, রাজবালাদের বিলাস-কানন এটা।'

হাসি মিলিয়ে যায় বিদ্যাধরের। হতভম্বের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে ওঠে। জড়িতস্বরে বলে, 'হ্যাঁ, না—হ্যাঁ, এই ভুল করে'—

আরও কঠিন হয়ে ওঠে সুলোচনা। ভীরুতার সীমা আছে, সহ্যেরও। চির মিথ্যাবাদী কামনার সহচর। কর্কশকণ্ঠে সে বলে, 'বামন হয়ে যে চাঁদ ধরতে চায়, সে বাতুল।'

সুলোচনা অপেক্ষা করেনি। সখীরা কলস্বরে হেসে উঠেছিল। কেমন করে সে শ্লেষ হাসি হজম করল ভীরু? সুলোচনার উত্তর শুনেও কেমন করে বিবাহের প্রস্তাবে রাজি হল?

আর রাজপুত্র মাধব! চন্দ্রকলা বলেছে, তিনি শুধু রূপবান্ নন,—বীর। সুঠাম বলিষ্ঠ দেহে নবযৌবন-মাধুরী, বালসূর্যের মত স্নিগ্ধ।

সুলোচনার চিত্ত-চকোর মাধব। সুলোচনা তার জন্য প্রতীক্ষা করবে। যদি প্রয়োজন হয়, অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে বীরা রাজনন্দিনী। সূর্যপ্রিয়া পদ্মিনী সূর্যকেই কামনা করে।

কিন্তু, পিতার আদেশ কেমন করে লঙ্ঘন করবে সুলোচনা? কুমারী

কন্যা পরতন্ত্র, পিতার অধীন। গুরুজনের আদেশ অমান্য করা অন্যায়।

এলোমেলো চিন্তার সূত্র। পরিহাসপ্রিয় সখীরা ভয়ে দূরে সরে গিয়েছে। অস্থির সুলোচনা। তার ইচ্ছা হয়, গন্ধাধিবাসের উপকরণ-গুলিকে সে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে।

সহসা চপল কলহাস্যে কক্ষ মুখর করে প্রবেশ করল রাজমালঞ্চের মালিনী, 'রাজকন্যার জন্য ফুলের গন্ধাধিবাস নিয়ে এলাম। কই গো, কন্যা কোথায় ?'

পুষ্পকরণ্ড হাতে নিয়ে দাঁড়াল রাজপুরীর মালিনী। নাম তার গন্ধিনী। হাস্যরসিকা প্রৌঢ়া। সকলেরই বয়স্যা। দেহে যৌবন নেই, কিন্তু রঙ শুকিয়ে যায়নি। তার রসিকতায় কুমারীর বদন আরক্ত হয়, বিগত-যৌবনার দেহে রসের বান ডাকে।

গম্ভীর রাজকন্যার সম্মুখে হেসে ফুলের ডালা নামাল সে ? বাঁকা চোখে দেখল, কন্যার মুখে শাঁওন মেঘের ঘটা। বর্ষণ যদি শুরু হয়, প্রলয় নামবে পৃথিবীতে। কারণ অজ্ঞানা নয়।

কুসুম-প্রিয়া সুলোচনা কঠিন হয়ে কুসুমের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইল। অন্যদিন হলে মুখর হয়ে উঠত রাজকন্যা, রঙ্গরসের সংলাপ উঠত জমে। কিন্তু আজ কুসুমের প্রতি কুসুম-প্রিয়ার চণ্ডীর মত অভিমান।

গন্ধিনী ভয় পেল না। স্মিতহাস্যে সে বলল, 'ফুলের কি দোষ ? রাজকন্যার বিয়ের ফুল ফুটবে বলে মালঞ্চে আজ অনেক ফুল ফুটেছে। এতফুল কখনো ফোটে না,—যুঁই, টগর, চাঁপা, বেল।'

সুলোচনা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। ফুলের কথা শুনতেও পায় না বুঝি।

গন্ধিনী বলল, 'সে এক আশ্চর্য ব্যাপার ! মালঞ্চে ফুল ফোটে না, আজ যেন হঠাৎ বসন্ত নামল। তাকিয়ে দেখি, শুধু বসন্ত নয়, বসন্ত-সখাও এসেছে।'

ফিরে তাকাল সুলোচনা। গম্ভীর মুখ।

হেসে বলল গন্ধিনী, 'তিনিই আজ মালা গেঁথেছেন। এ বুড়ীর হাতের মালা নয়। মালা গেঁথেছে যে, তার নবীন বয়স। যেমনি রূপ, তেমনি গুণ। মালাগাঁথার কারিগরিও অসাধারণ। এতখানি বয়স হল, এমন মালা কখনো দেখিনি।'

সুলোচনার ডাগর চোখে কৌতূহল। বাঁকা চোখে ফুলের দিকে তাকাল সে। মালিনী বলতে লাগল, 'মালা গেঁথে সে আমায় বলল, যাও মালিনী, আজ রাজকন্যার গন্ধাধিবাস, এই নতুন ফুলের গন্ধাধিবাস তাকে দিয়ে এস। গন্ধপুষ্পে গন্ধাধিবাস সার্থক হক।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফুলের ডালার দিকে তাকাল সুলোচনা। কুসুমস্রজে অদ্ভুত বিননি! অনিচ্ছাসত্ত্বেও অধিবাস হাতে তুলে নিল সে। একি! মালা দিয়ে জড়ানো একটি ফুলের কৌটা,—কেয়াফুলে গড়া কৌটা। আশ্চর্য তার গঠন কৌশল।

নিমেষে কৌটার ঢাকনা খুলে ফেলল সে। কম্পিতাঙ্গী বীরাঙ্গনা। অজানা ভয়, অজানা শিহরণ! ভয়ে সে কাঁপেনি কোনদিন। কৌটার সামগ্রী দেখে আজ সভয়ে কাঁপছে সে।

কৌটার ভিতরে একটি ফুলময় রতিমূর্তি, একটি উদ্যত পুষ্পধনু, আর একটি সুদৃশ্য কাম-অঙ্গুরী। অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্য, আশ্চর্য সামঞ্জস্য বোধ। পুষ্পময় রতিদেহ যেন জীবন্ত রতি-বিগ্রহঃ রক্তকমলে গড়া শোভন মুখ, নীলপদ্মের নয়ন, অপরাজিতার কুন্তলজাল; তিলফুলে গড়া নাসিকা, বান্ধুলি ফুলে অধরপুট। সেই অপরূপ লাবণ্যভরা রতি-তনুকে লক্ষ্য করে উদ্যত সূচিমুখ কুসুমশর, পঞ্চপুষ্পের পঞ্চশর।

পুষ্পের গন্ধাধিবাস হাতে নিয়ে থর থর কাঁপছে বীরিণী সুলোচনা। দেহতল্লে প্রবল কম্পন। মাথা ঘুরছে, ঘুরছে মেদিনী। এ রতিদেহ কার? কুসুমশর যেন উদ্যত হয়েছে তারই দিকে। অসহায়া সুলোচনা। জীবনে অনেক আক্রমণ প্রতিহত করেছে সে, কিন্তু এ আক্রমণ প্রতিহত করার কৌশল তার জানা নেই। ব্যর্থ বীরাঙ্গনার অস্ত্রশিক্ষা। অব্যর্থ উদ্যত পঞ্চশর।

'কে এই মালা গেঁথেছে?' —কম্পিতস্বরে শুধায় সুলোচনা।

'যে নাগর কাল সন্ধ্যায় এসে আমার মালঞ্চে আশ্রয় নিয়েছে'—মধুর হেসে উত্তর দিল গন্ধিনী।

'কি তাঁর নাম?' —দুরু দুরু বুকে প্রশ্ন করল সুলোচনা।

'নাম তাঁর মাধব।'

'মাধব!'

আবেশে সুলোচনার চোখ বুজে আসে। বীরকন্যার দেহের সকল শক্তি যেন লোপ পেয়েছে। অবশ সুলোচনা, রক্তে অজানা আনন্দ-দোল।

গন্ধিনী বলে, 'কাল সন্ধ্যায় ঘোড়ায় চড়ে এল সেই নবীন নাগর, সঙ্গে একজন ভৃত্য। আমি বললাম, ওগো কোন্ বৃন্দাবনের মাধব তুমি? শুনেছি, মাধবের অনেক গোপী। তোমার গোপীসংখ্যা কত? বিদেশী নাগর যেন রসের সাগর। স্মিতহাস্যে বলল, আমি গোপীহীন মাধব। তমাল বন থেকে নয়, এসেছি তালীবন থেকে। অনেক কষ্টে সৈন্ধবে এসেছি এই দুর্গম সিন্ধুপারে। আমি বললাম, কেন এলে? নীলচোখ তুলে সে বলল, মকর-কেতন আমায় ঘরছাড়া করেছে। পরাজিত হয়ে আমি গৃহহারা হয়েছি। এখন আমি আশ্রয়ার্থী, আমার দূতী হতে পার? শুনে ভারি দুঃখ হল, বললাম, বেশ, বল, কার কাছে যেতে হবে? নির্ভয়ে সে বলল, যার লোচনের অনেক খ্যাতি, তাঁর কাছে। আমি বললাম, ওগো সুন্দর নাগর, বড় বিলম্বে এসেছ। সে বলল, কেন? আমি বললাম, এরাজ্যে অতি শোভন লোচন যাঁর, কাল তাঁর গন্ধাধিবাস। তিনি নিজেই এখন শরণার্থী। শুনে তাঁর মুখখানি কালো হয়ে গেল, যেন পূর্ণিমার চাঁদ অকস্মাৎ মেঘে ঢাকা পড়ল। খানিক মূঢ়ের মত থেকে সে বলল, তবু চেষ্টা করতে হবে। যে বধূর জন্য বন্ধু-বান্ধব হারিয়েছি, সাগর উল্লঙ্ঘন করেছি, অন্তত তাঁকে একবার চোখের দেখা দেখে প্রার্থনা জানাতে হবে। মনের সাধ যদি পূর্ণ না হয়, বীরের হৃদয়-

অর্ঘ্য রেখে যাব সুনেত্রার চরণতলে। বলতে বলতে চোখদুটি সজল হয়ে উঠল তাঁর। আমি বললাম, বেশ, লিখন দাও। এই ফুলের মালা গেঁথে সে আমার হাতে দিল, বলল, রাজকন্যা যদি এই লিখনের অনাদর করেন, তাহলে গঙ্গাসাগরে এ-জীবন বিসর্জন দেব, আর যদি আদর করে গ্রহণ করেন, তাহলে প্রাপ্যবস্তু লাভের জন্য জীবন পণ করব। মাধব বিপদকে গ্রাহ্য করে না।'

একদৃষ্টিতে মালার দিকে তাকিয়ে থাকে সুলোচনা। ফুলের বিননি যেন অনেক না-বলা কথার বিননি। তাতে অনেক ভাষা, অনেক আশার সঙ্কেত। বকুলে বুকের অশ্রু, যূথিকায় মুখের হাসি। কত কথা জানে নবীন নাগর! ফুলের ভাষায় যার এত কথা, মুখের ভাষায় না-জানি কত মধু।

মালা হাতে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকে সুলোচনা। চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। আজ তার গন্ধাধিবাস। মাধবের পুষ্পমালা গ্রহণ করার অর্থ, বিপদের মুখে পা বাড়িয়ে দেওয়া। পরমুহূর্তেই সঙ্কল্পে স্থির হয় রাজনন্দিনী, রাজরাজেন্দ্রাণীর মত গ্রীবাভঙ্গি করে দাঁড়ায়। মানস-বিহারী হংস, ঝড়ে তার ভয় কি? জীবনের স্বাদ বিঘ্নবরণে, বিঘ্নজয়ে।

পুষ্পে পুষ্পে নবপুষ্পমালা রচনা করে সুলোচনা। কুসুম-সঙ্কেতে লেখে উত্তরের প্রত্যুত্তর। তারপর গন্ধিনীর হাতে সেই লিখন পাঠিয়ে দেয়। নতুন গন্ধাধিবাসে মন ভরে উঠেছে। ক্ষণেক্ষণে লজ্জায় অরুণ হয়ে উঠছে কপোল ও কর্ণ। বিচিত্র অনুভূতি! বিনিস্যূতার কাম-অঙ্গুরী পরম আদরে অনামিকায় ধারণ করে স্থিরনেত্রে সেই অঙ্গুরীর দিকে তাকিয়ে থাকে সুলোচনা।

উত্তর পাঠিয়েও স্থির থাকতে পারে না সে। উতল ঢেউ উঠেছে মন-সাগরে। থৈ থৈ জল। অঙ্গে অঙ্গে পুলকাঞ্চন। কেমন সে নাগর? কাঁচা সোনায় গড়া নাকি তাঁর অঙ্গ, সে অঙ্গে বীরত্বের দীপ্তি।

মুহুর্মুহু কেঁপে ওঠে রাজকন্যা। অস্থিরভাবে ঘরময় পদচারণ করে, নিজের মনেই কি যেন বলে। চলতে চরণ স্খলিত হয়, কথা বলতে

স্খলিত হয় বচন। সখীদের ডেকে গদগদস্বরে সে বলে, 'ওলো, আজ স্নানে যাব ক্ষীরোদসাগরে, মালিনীর মালঞ্চ হয়ে। অধিবাসের দিনে ফুলের গন্ধাধিবাস শুভকর হবে।'

বিস্মিত হয় সখীর দল। মেঘ-মুখে অকস্মাৎ এ হাসির উচ্ছ্বাস কোথা থেকে এল? কারণ যাই হোক, সখীর মুখে হাসি ফুটেছে—এই যথেষ্ট। ভাগ্য ভাল বিদ্যাধরের। হয়তো মনস্থির করেছে রাজকন্যা।

হেলেদুলে মালিনীর মালঞ্চে উপস্থিত হল সুলোচনা, সঙ্গে কলমুখর সখীর দল। থরে থরে ফুল ফুটেছে মালঞ্চে। মালিনীর কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু সেই ফুলটি কোথায়? খঞ্জনের মত চঞ্চল সুলোচনার দৃষ্টি।

হেসে এগিয়ে এল মালিনী, 'এস এস, ঘরে এস। মালিনীর কুটীরে আজ চাঁদের হাট।'

সুলোচনা কুটীরের দিকে এগিয়ে চলল, পিছনে সখীর দল। কিন্তু দ্বারের কাছে যেতেই চিত্রার্পিতের মত থমকে দাঁড়াল রাজকন্যা; স্তম্ভিত চরণ, স্তম্ভিত দৃষ্টি! কুটীরের শয্যায় শয়ন করে রয়েছে কন্দর্পকান্তি কুমার, যেন ফুটন্ত পদ্ম, যেন পূর্ণিমার চাঁদ, যেন একখানি মধুর স্বপ্ন।

দেহময় স্বেদ-রোমাঞ্চ। মধুমত্ত ভ্রমরের মত নিশ্চল পক্ষ্ম। সুলোচনা লোচন ফিরাতে পারে না, যে অঙ্গে দৃষ্টি পড়ে, সেইখানেই দৃষ্টি স্থির হয়ে থাকে। মন্মথ-সুন্দর মূর্তি, আশ্চর্য তেজোব্যঞ্জক। মোহিতা বীরিণী। মুগ্ধার মত তাকিয়ে থাকে সে।

কন্‌কন্‌ বেজে ওঠে সখীদের কঙ্কণ, মুখে গুন্‌গুন্‌ গুঞ্জন।

ঘুম ভেঙ্গে যায় কুমার মাধবের। ত্রস্তে শয্যায় উঠে বসে সে। ঘরে কি চাঁদের মেলা বসেছে? একি স্বপ্ন, না মায়া!

চার চোখের বিমুগ্ধ মিলন। মত্তভৃঙ্গ একদৃষ্টে চেয়ে আছে প্রমুদিত কমলের দিকে, কমল তাকিয়ে আছে বিভোল ভৃঙ্গের পানে। নির্বাক রূপ-সম্ভোগ। প্রেমিক প্রেমিকার প্রথম সাক্ষাৎ এমনি ভাষাহীন চিরকাল। নীরব মাধব, নীরব সুলোচনা।

নীরবতা ভঙ্গ করে রসিকা গন্ধিনী, 'মালিনীর মালঞ্চে এসে ভোমরা কি ভাষা হারাল ?'

হেসে উত্তর করল মাধব, 'ভোমরার গুন্‌গুন্‌ ততক্ষণ, যতক্ষণ মনের মত ফুল না মেলে। মধুর ফুল পেলে ভুলেও ভ্রমর গুন্‌গুন্‌ করে না।'

একটু নীরব থেকে উত্তরের প্রত্যাশা করে মাধব। তেমনি বিহ্বল তাকিয়ে আছে কমলসম নয়ন। মাধব বলে, 'ওগো মালিনী, তোমার মালঞ্চের ফুলের তুলনা নেই। যেমন বর্ণ, তেমনি সৌরভ। বিধাতা তার শিল্প-কৌশল উজাড় করে দিয়েছেন। লাবণ্যময় তনু, মাধুর্যের সার! এত ধনে ধনী, তবু মধু দিতে কৃপণতা কেন ?'

লজ্জায় আরক্ত সুলোচনা। বীর্যবতী রাঙা হয়ে ওঠে কথার ঘায়ে। কিন্তু উত্তর করতে পারে না। বাচন-নিপুণতা তারও কম নয়। তবু কিসের যেন সঙ্কোচ। ভোরের আলোয় কমল-কলি ফুটি-ফুটি করে, মুখ মেলে সূর্যের পানে তাকাতে চায়, পারে না।

অনেকক্ষণ পরে সঙ্কোচ কাটিয়ে ওঠে সুলোচনা, ধীরে ধীরে বলে, 'মালঞ্চের ফুলে কড়া পাহারা। এতো বুনো ফুল নয় যে, যে-কেউ মধু লুটে নেবে? তার জন্য চাই কৌশল, চাই দেহের বল।'

'মধু চুরি করেও নেওয়া যায়।'

'নেওয়া যায়, যদি চোর চতুর হয়। কিন্তু রাজার মালঞ্চ থেকে ফুল চুরি করা সহজ নয়।'

শয্যা থেকে নেমে উঠে দাঁড়ায় মাধব। অঙ্গধর অনঙ্গ। চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করে, 'বৃথা তাহলে সিন্ধুপারে আসা ? বৃথা এই শ্রম ?'

উন্মুখ সখীদল, তারা জানে, বৃথা এই শ্রম। গবাক্ষ ধরে উগ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মাধব-ভৃত্য প্রচেষ্ট। তারও প্রশ্ন, বৃথা এই শ্রম ?

সখীদের বিস্মিত করে উত্তর করে সুচতুরা সুলোচনা, 'শ্রম বৃথা হবে কেন? কার্যসিদ্ধি হলেই শ্রমান্ত।'

সীমা যেন ছাড়িয়ে গিয়েছে প্রগল্‌ভা রাজকন্যা। সভয়ে বাধা দিয়ে

বলে সখী ইন্দুলেখা,—'কার্যসিদ্ধি কেমন করে হবে? অধিবাসিতা কন্যা পিতার আদেশ লঙ্ঘন করতে পারে না।'

'লঙ্ঘন করতে পারে না, কিন্তু শক্তিমান কন্দর্প অঘটন ঘটাতে পারে।'—বলে অধীরা সুলোচনা। জিজ্ঞাসু নেত্রে রাজকন্যার পানে তাকায় বীর মাধব।

স্থিরকণ্ঠে সুলোচনা বলে, 'বিবাহকালে কন্যাকে দেখার অধিকার সকলের। বিদেশী বীরকুমার সেই সুযোগে নিজ বীরত্বে তাঁর প্রিয়াকে গ্রহণ করতে পারেন। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, বীরভোগ্যা জয়শ্রী। রাজকন্যাও বীরবাহুকে আশ্রয় করতে চায়।'

সুস্পষ্ট সঙ্কেত। আর সঙ্কুচিতা নয় সুলোচনা। প্রেমের বীর্যে অশঙ্কিনী প্রেম-নায়িকা। ঘরকে ছেড়ে পরকে গ্রহণ করার শক্তি জোগায় প্রেম। প্রেম শক্তির আধার বলেই অজানাকে সে বরণ করে অতি সহজে। সেই প্রেম জেগেছে সুলোচনার অন্তরে। তাকে দুঃসাহসিকা করে তুলেছে প্রেমের তেজ। চোখ জ্বলছে আশ্চর্য প্রেম-মহিমায়।

বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে বীরাঙ্গনার দিকে তাকিয়ে থাকে বীর মাধব। স্তম্ভিতা সখীদল। সুলোচনার সাহস তাদের অজানা নয়, কিন্তু এতটা দুঃসাহসী সে,—কল্পনা করতেও ভয় পায় তারা। সভয়ে তারা বলে, 'অনেক বেলা হয়েছে সখী।'

কি যেন ভাবে সুলোচনা, তারপর বলে, 'হ্যাঁ, অনেক বেলা হয়েছে। আসি তবে, কুমার!'

মাধব তাকে 'থাক'ও বলতে পারে না, আবার 'যাও',—একথা বলতেও মুখে বাধে। সে শুধু বলে, 'সত্য যেন সত্য থাকে, রাজকুমারী!'

জীবনের নতুন গন্ধে অধিবাসিতা হয়ে সখী সুলোচনা রাজপুরীতে ফিরে আসে। দিন ভরে ওঠে কল্পনায়, রাত্রি ভরে ওঠে মধুর স্বপ্নে। কোন্ পাহাড়ে ঢল নেমেছে, সেই ঢলে ঢলঢল সুলোচনা-নদী। তার পাশে নেচে নেচে চলেছে উচ্ছল তরঙ্গের ঝাঁক। তার সঙ্গে নটিনীর মত চলেছে সুলোচনা। রক্তে রক্তে নৃত্যের দোলা। সাগর-সীমা কতদূর!

পরদিন রাজপুরীতে বিবাহের সানাই বেজে উঠল। চারদিকে আনন্দ-কোলাহল, মাঙ্গল্য চিহ্ন। দেখতে দেখতে এল সন্ধ্যা, যেন কৃষ্ণবাসে ঢাকা শোকম্লান বধূ। বিবাহের বরের মত গগনে উদিত হল তারা বিভূষিত উৎফুল্ল সোম। হাসির চন্দ্রিকায় শোকার্তা বধূর ঘোমটা খুলতে চায় সে।

উৎসব-চিহ্নে চিহ্নিত বিবাহ-সভা। কোথাও গান, কোথাও নৃত্য, কোথাও হুলুরব, শঙ্খধ্বনি, কোথাও বা অবিধবাদের অকারণ হাসির রোল।

বরের আসনে বসেছে স্রক্-চন্দনে ভূষিত বিদ্যাধর। আজ তার অঙ্গ-সজ্জার বাহার। আনন্দ-সাগরে জোয়ার ডেকেছে, সেই জোয়ারে ভেসে চলেছে সে। বিষ্টরাসন নিবেদন করে রাজা স্বয়ং ভাবী-জামাতাকে বরণ করেছেন। এবার বর-বধূর মুখচন্দ্রিকা!

গম্ভারী-কাষ্ঠনির্মিত পীঠে আরোহণ করে আসছে সুলোচনা। তার পাশে সখী চন্দ্রকলা, মালিনী গন্ধিনী ও আরো অনেকে। ঝর্ঝর-ডিণ্ডিম বংশীধ্বনিতে তুমুল বাদ্যোদ্যম, হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনিতে তুমুল কোলাহল। চরম আনন্দ ও উত্তেজনা।

বরকে প্রদক্ষিণ করছে সালঙ্কারা কন্যা—একবার, দুইবার, তিনবার। উজ্জ্বল আলোকে ধন্ধ নয়ন, উচ্চ কোলাহলে বধির শ্রবণ। সহসা সুলোচনা বামহস্ত উত্তোলন করল। কে যেন সবলে সেই হাত ধরে আকর্ষণ করল। দ্রুতবেগে নববধূর হাত ধরে ভিড় ঠেলে অগ্রসর হচ্ছে সে। দেহে মত্তহস্তীর বল। নিমেষ পড়ার অবসর পেল না, প্রতিবাদ উত্থিত হওয়ার সুযোগ হল না, পলকে অঘটন ঘটে গেল। বিবাহের বধূকে ত্বরিতে অশ্বপৃষ্ঠে তুলে তুরন্ত বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল হরণকারী।

ব্যাপারটি ঘটল এত দ্রুত, যে স্তম্ভিত সভা। কে যেন সম্মোহিত করেছে তাদের। কি হচ্ছে, কি ঘটছে—প্রশ্ন করার শক্তি পর্যন্ত নেই। যখন সম্বিৎ ফিরে এল, তখন বিবাহ-সভায় প্রচণ্ড কোলাহল উঠল, 'কন্যা

অপহৃতা হচ্ছে, তোমরা অনুসরণ কর, অগ্রসর হও, দস্যুকে শাস্তি দাও।' সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার, তর্জন, গর্জন। মুক্ত-কোষ তরবারির ঝলকে ঝলকিত সভা-মণ্ডপ। কিন্তু কোথায় সে দস্যু ?

শূন্য সভায় মূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে আছে বর বিদ্যাধর, শিরে করাঘাত করে হাহাকার করছেন প্লক্ষরাজ। স্তম্ভিত সাদী, নিষাদী, রথী, ধানুকী। এ যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

জনতার নীরবতা ক্ষণকালের। মুহূর্ত পরেই হাজার কণ্ঠে কথার খই ফোটে ঃ সমালোচনা, জল্পনা, অলৌকিক কল্পনা ঃ

'এর জন্য দায়ী কোট্টপাল।'

'কোট্টপাল নয়, বিবাহ-মণ্ডপের দ্বাররক্ষী।'

'দ্বাররক্ষীর কি দোষ ? এ দৈব মায়া।'

'আমি স্বচক্ষে দেখেছি, দেবরাজ ইন্দ্র তাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছেন।'

'না-না, ইন্দ্র নন—স্বয়ং বিষ্ণু। রাজকন্যা সুলোচনা শাপ-ভ্রষ্টা লক্ষ্মী। শাপান্তে বিষ্ণু তাকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে গেলেন।'

'না,—চন্দ্রকে রাহু গ্রাস করেছে।'

'মিথ্যা কথা। আমি স্পষ্ট দেখলাম, নলিনীভ্রমে দিগ্‌গজ তাকে ভক্ষণ করেছে।'

'তাও কি হয় ? তিনি বীরাঙ্গনা। স্বর্গ জয় করার জন্য তিনি যাত্রা করেছেন। স্বর্গ জয় করে এখনি ফিরে আসবেন।'

রাজা কোন কথা শুনছেন না। অঙ্কুশ-বিদ্ধ ঐরাবতের মত হাহাকার করছেন তিনি, 'একি হল ?'—আর বরণ-পীঠ বুকে জড়িয়ে ধরে বিলাপ করছে ব্যর্থকাম বিদ্যাধর, 'হা প্রিয়ে, তুমি কোথায় গেলে ? আমাকে শোক-সাগরে ডুবিয়ে কোথায় গেলে তুমি ?'

রোদনে-বিলাপে শোকাকুল দশদিক, অশ্রুতে সিক্ত বসুধাতল। কিন্তু বাইরে দুঃখিতা হলেও অন্তরে নন্দিতা মালিনী, চন্দ্রকলা, আর সখীর দল। তারা ভাবছে, বীরবাহু আশ্রয় করেছে বীরাঙ্গনা, যোগ্যের

সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যোগ্য। এ রাজযোটক সুখের। শুভ সংঘটনে আক্ষেপ করে মূঢ়জন।

তখন বন-পাহাড় অতিক্রম করে বিদ্যুৎবেগে ছুটছে শিক্ষিত তুরগ। তার পায়ের ঘায়ে মর্মরিত বনভূমি, খুরের ঘায়ে প্রজ্বলিত প্রস্তর-শিলা। নিমেষে যোজন যোজন পথ অতিক্রম করছে সে। রহস্যময় চাঁদের আলো যেন একটি কম্পিত শুভ্র যবনিকা। জঙ্গম গাছ-পাহাড়, চলন্ত দিগন্ত। সামনের বস্তু পলকে মিলিয়ে যাচ্ছে পিছনে। কিছুই দূরে নয়, কিছুই কাছে নয়। এমনি প্রবল গতিবেগ।

সেই গতিতে অশ্বপৃষ্ঠে ঝড়ের বেগে দুলছে দুটি প্রাণী। সামনে সুলোচনা, পিছনে তার হরণকারী। এত দ্রুত বেগ,—সুলোচনা চোখ মেলতে পারছে না, দেখতেও পারছে না কিছু। শুধু অনুভব করছে, প্রচণ্ড গতিতে অভিসারে চলেছে যেন দুঃসাহসিকা ধরণী। তার বুকে প্রলয়ের কাঁপন, অঙ্গে আনন্দের বিপুল শিহরণ। সে চলছে আর চলছে, চলার শেষ নেই—পথের অন্ত নেই। সঞ্জরা প্রমত্তা অভিসারিকা চলার আবেগে সঙ্কেতকুঞ্জের নিশানা ভুলে গিয়েছে। চোখে নীহারিকার নাচন।

বিবাহের কোলাহল কখন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন বধূর বুকে মিলনের মধুস্বপ্ন। দুরন্ত ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে সেই মধুমিলনের স্বপ্নাভিসার। আবেশে চোখ বুজে থাকে সুলোচনা। এ স্বপ্ন যেন না ভাঙে।

শেষ রাতে অশ্ব এসে থামল এক গৃহের সম্মুখে। শ্রান্ত অশ্বের দারুণ হ্রেষারবে সম্বিৎ ফিরে এল সুলোচনার। মন্ত্রমুগ্ধার মত অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নামল সে। বিদেশীর হাত ধরে এল এক সজ্জিত কক্ষে। উজ্জ্বল

প্রদীপালোকে মুখ তুলে তাকাল সুলোচনা। কিন্তু মুহূর্তেই বিস্ময়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল সে, 'একি! কে তুমি? কে তুমি?'

তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বীর বঁধু মাধব নয়, মাধবের ভৃত্য প্রচেষ্ট। বিকৃত, কদাকার দেহ—চোখে-মুখে বিকৃত কামনার কুটিল হাসি। সুলোচনার মনে হল, একটা অতি ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তু করাল দন্ত বিস্তার করে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে তাকে। মাধবী কুঞ্জে প্রবেশ করেছে বিষাক্ত সর্প, দংশনের জন্য ফণা তুলেছে সে।

শিউরে ওঠে বীরাঙ্গনা। চোখে নিঃসীম অন্ধকার।

হেসে বলে প্রচেষ্ট, 'মাধব-ভৃত্য আমি, প্রচেষ্ট। প্রভুকে নিশ্চেষ্ট দেখে আমি তোমায় বিবাহ-বাসর থেকে হরণ করেছি। দেবদুর্লভ রমণীরত্ন তুমি। তুমি আমায় বরণ কর।'

মাথা ঘুরছে সুলোচনার, পায়ের নিচে থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে। কিন্তু বিপদে ধৈর্য হারায় না বীরাঙ্গনা। স্থির হয়ে সে দাঁড়ায়। সমস্ত অবস্থা বুঝতে চেষ্টা করে।

প্রচেষ্ট বলতে থাকে, 'কার্যকালে যে পুরুষ নিদ্রা যায়, লক্ষ্মী তাকে কৃপা করেন না—যে পুরুষ উদ্যোগী হয়, লক্ষ্মী-শ্রী তারই করায়ত্ত। তোমার বিবাহকালে সুখস্বপ্নে মগ্ন হল মাধব, ঘুমিয়ে পড়ল সে। ধিক্ তার মত কাপুরুষকে, যে তোমার সঙ্কেত বিস্মৃত হয়ে নিদ্রার আরাধনা করে। আমি দেখলাম, সঙ্কেত নিষ্ফল হয়ে যায়। মাধবকে জাগাতে প্রবৃত্তি হল না। তোমার মত কন্যারত্ন অন্যের হস্তগত হলে আমার লাভ কি? দৃষ্টির পীড়া মাত্র। তাই ভাবলাম, এ সুযোগ আমি ছেড়ে দিই কেন? অর্থের জন্যই আমার দাসত্ব। তোমাকে লাভ করলে সে অর্থ আমার করতলগত হবে। তাই মাধবের অজ্ঞাতসারে আমি সুযোগ গ্রহণ করেছি। এখন হে সুন্দরী, তুমি আমায় গ্রহণ কর।'

মূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থাকে সুলোচনা। বিষম সঙ্কট। বিধাতা কি এই দুশ্চেষ্ট প্রচেষ্টকেই তার ভাগ্যে লিখেছেন? রহস্যময় বিধিলিপি।

মানুষের আশাকে নিমেষে ধূলিসাৎ করে দেয় অদৃষ্টের লিখন। তার কাছে পৌরুষ পরাজিত। কর্তব্য স্থির করতে পারে না বীরবালা।

স্মর-উন্মাদনায় বিহ্বল প্রচেষ্ট বলে, 'বিলম্ব করছ কেন? ওগো রূপকুমারী, আমায় বরণ কর। আমার রূপ নেই, রূপের মোহ আছে। তোমাকে দেখেই পাগল হয়েছিলাম আমি। কিন্তু ভৃত্য বলে সে দুরাশা প্রকাশ করতে পারিনি। এখন তুমি আমার। অশ্বপৃষ্ঠে তোমার অঙ্গস্পর্শে স্মরের শরাঘাতে জর্জরিত হয়েছি। ওগো মোহিনী, তোমার মোহন স্পর্শে আমার অঙ্গ শীতল কর, তোমার অধরামৃত পান করিয়ে শ্রান্ত আমাকে সুস্থ কর।'

এগিয়ে আসে উদ্ধত লালসা। মুহূর্তে স্থির হয়ে দাঁড়ায় সুলোচনা। পশুশক্তিকে পরাভূত করার মত উপস্থিত বুদ্ধি তার আছে। স্নিগ্ধ কঠিন স্বরে সে বলে, 'আপনি শান্ত হন। বিধাতার অভিপ্রায় আমি বুঝেছি। আমি আপনার পত্নী হব—এই তাঁর ইচ্ছা। বিধাতার ইচ্ছা ব্যর্থ হয় না—নইলে আজ কোথায় বিদ্যাধর, কোথায় বা মাধব!'

'হুঁ-হুঁ কোথায় বিদ্যাধর, কোথায় মাধব! জয়ী সচেষ্ট প্রচেষ্ট।'—তৃপ্তির হাসি হাসে মূর্খ প্রচেষ্ট।

'পুরুষের মধ্যে আপনি পুরুষ-সিংহ'—বলে সুলোচনা।

প্রশংসাবাক্যে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে কাপুরুষ।

'বীরাঙ্গনা বীর পুরুষকেই পতিরূপে কামনা করে।'

কাম-লালসায় জ্ঞান হারায় প্রচেষ্ট।

সুলোচনা বলে, 'যিনি বীর, তিনি মোহবশত অধর্ম আচরণ করেন না। আর আমিও আপনার ভাবী পত্নী হয়ে আপনাকে অধর্ম আচরণে প্ররোচিত করতে পারি না।'

বিচারমূঢ় প্রচেষ্ট জিজ্ঞাসু নেত্রে সুলোচনার দিকে তাকায়। সুলোচনা বলে, 'আপনি নিশ্চয় জানেন, অবিবাহিত কন্যাগমন পাপ?'

'শাস্ত্রে তাই বলে—

'আমি এখনও অবিবাহিতা—

'কিন্তু আমি যে—

'আপনি আমাকে বিবাহ করে যথাবিধি সম্ভোগ করুন। বিবাহ-যোগ্য বস্তু আনয়ন করে, হে বীর, আপনি বীরাঙ্গনার পাণিগ্রহণ করুন।'

সুলোচনার কথায় প্রীতিতে বিগলিত হল মূর্খ প্রচেষ্ট। গর্বভরে সে বলল, 'ঠিক বলেছ। এই মুহূর্তেই আমি বিবাহের আয়োজন করছি। তুমি ততক্ষণ অপেক্ষা কর। শাস্ত্রোক্ত বিধানেই আমি তোমার পাণিগ্রহণ করব।'

সুলোচনাকে একাকী প্রকোষ্ঠে রেখে বেরিয়ে গেল দাম্ভিক প্রচেষ্ট।

ততক্ষণে নিজেকে একা পেল সুলোচনা। দিন-রাত্রির উপবাস, তদুপরি পরিশ্রম। কিন্তু ক্লান্তি নেই তার। এ অবস্থায় ক্লান্তি থাকতে পারে না। দুঃসাহসিকা নিজে দুঃখের পথে পা বাড়িয়েছে। পিতার নির্বাচন উপেক্ষা করে সে স্বয়ম্বরা হয়েছে। বিপদে অধৈর্য হলে চলবে না। দুশ্চেষ্ট প্রচেষ্টর হাত হতে মুক্ত হতে হবে। সে কামিনী নয়, প্রণয়িনী—দুঃসাহসিকা প্রণয়িনী। প্রেম যদি সত্য হয়, প্রেমই মুক্তির পথ দেখাবে।

হাতে এখনও রয়েছে অধিবাস-সূত্র। বারেক সেই সূত্রের দিকে তাকায় সুলোচনা। মনে পড়ে বিদ্যাধরের কথা। হায়, সুন্দর কাপুরুষ! এখনও অনামিকায় রয়েছে মাধবের দেওয়া কাম-অঙ্গুরী। পুষ্প শুষ্ক প্রায়, শিথিল বিনি সূতার বন্ধন। সুলোচনা কি মাধবকে ভুলতে পারে? মনে মনে পতিরূপে বরণ করেছে তাকেই। পিতার আদেশের অপেক্ষা করেনি কুমারী। প্রেমের দুঃসাহস, সে কারও অপেক্ষা করে না। দুর্বার মন্মথ গতি, সকল শাসন-নাশন।

সুলোচনা কি ভুল করেছে? ভুল করেনি। মাধব বীর, মাধব প্রেমিক। সুলোচনার জন্য তিনি দুর্গম পথের দুঃখ বরণ করেছেন, কোন্ দূর দেশ থেকে এসেছেন সিন্ধুপারে। বীরাঙ্গনা বীরকেই আত্মদান

করেছে। কিন্তু অদৃষ্ট বিরূপ—তাই সময় কালে সঙ্কেত বিস্মৃত হয়েছে প্রেমিক। তাই বলে সুলোচনা মাধবকে বিস্মৃত হতে পারে না। তাকে বাঁচতে হবে। জীবনে বাঁচলে সঙ্কল্প সিদ্ধি হতেও পারে। দুঃখ জীবনে আসেই, সেই দুঃখে যারা ধৈর্য ধারণ করে, তারাই সুখের মুখ দেখে। সুখ-দুঃখ ঘুরন্ত চক্রের মত আবর্তনশীল। হিমাগমে মৃণালশ্লিষ্টা শুষ্ক মৃণালিনী। বসন্ত-ভৃঙ্গের জন্য তবু প্রতীক্ষা করে সে। বসন্ত আসে। ঈপ্সিত ভৃঙ্গবরকেও সে পায়।

কিন্তু সুলোচনা ভাবে, সে মুক্ত হবে কি উপায়ে?

সহসা দ্বার পথে দৃষ্টি পড়ে। পরম নিশ্চিন্তে বিচরণ করছে সেই প্রভুভক্ত বেগবান্ সৈন্ধব। অশ্বারোহণে পারদর্শিনী সুলোচনার মনে চকিতে মুক্তির উপায় সঙ্কেতিত হয়। এই অশ্বে আরোহণ করেই পালাতে পারে সে।

কিন্তু এই নারী বেশে একাকী নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা কি সঙ্গত? সঙ্গত নয়, শোভনও নয়। নারী—নারী। পুরুষের কামনার গ্রাস। আত্মরক্ষার শক্তি হয় তো তার আছে, কিন্তু লোকনিন্দাকে সে রোধ করতে পারে না। নারী সম্পর্কে চিরকাল শিথিলবাক্ মানুষ, চিতাভস্মে তার সতীত্বের পরীক্ষা।

সুলোচনার মস্তিষ্কে এক নতুন পরিকল্পনা খেলে যায়। আশৈশব পুরুষের মত পালিত হয়েছে সে, পুরুষের হাব-ভাব তার অজানা নয়। অস্ত্রবিদ্যায়ও শস্ত্রচালনায় সে নিপুণ। সে পুরুষের বেশ গ্রহণ করতে পারে।

প্রচেষ্টর গৃহ সজ্জা-শূন্য নয়। বিবাহের বেশ খুলে ফেলে ত্বরিতে পুরুষবেশ ধারণ করে সুলোচনা। মল্লের মত ধটি। হাতের অধিবাসসূত্র খুলে ফেলে দেয়। ওড়না দিয়ে বাঁধে উষ্ণীষ। দেহে তুলে দেয় পুরুষের অঙ্গাবরণ। কটিতে দৃঢ় বন্ধন করে অসিকোষ, হাতে নেয় সুদীর্ঘ এক বল্লম।

তারপর দ্রুত গৃহ থেকে বেরিয়ে সে অশ্বে আরোহণ করে। সুশিক্ষিত বেগবান্ সৈন্ধব আরোহিণীর ইঙ্গিতে সুতীব্র গতীতে পথে ছুটে চলে।

তখনও স্পষ্ট প্রভাত হয়নি। তখনও আলোর বুকে কিছু কালোর খেলা। অশ্ব ছুটে চলেছে বন পাহাড় পেরিয়ে। কোথায়? কোন্ দিকে? সুলোচনা জানে না। আরোহিণীর নির্দেশে অশ্ব নয়, অশ্বের নির্দেশে চলেছে আরোহিণী।

সহসা সুলোচনা দেখল, সাগরের তীর ধরে অশ্ব ছুটে চলেছে। পাশে ছুটে চলেছে অনন্ত নীল বারিধি—নীলায় নীল। এদিকে শাল-তমালের নিবিড় বন।

সুলোচনা বোঝে, লোকালয় দূরে নয়। সাগরের তীরে অসংখ্য নদীর মোহনা। নদীর বুকে ভেসে চলেছে লোকালয়ের নৌকা। সে অশ্বরশ্মি সংযত করে। শিক্ষিত অশ্ব সঙ্কেত বুঝতে পারে। গতি মন্দীভূত হয়।

মৃদুমন্দ গতিতে অশ্ব এসে উপনীত হয় সাগর তীরের লোকালয়ে। অশ্ব থেকে নেমে পড়ে সুলোচনা। অশ্বকে যথেচ্ছ বিচরণ করতে দিয়ে সে অগ্রসর হয়।

সাগরে এসে মিশেছে প্রকাণ্ড এক নদী। মোহনা-মুখে অসংখ্য লোকের সমাবেশ। কেউ স্নান করছে, কেউ তারস্বরে গঙ্গাস্তব পাঠ করছে।

একজন বটু ব্রাহ্মণকে ডেকে শুধাল সুলোচনা, 'এ কোন্ পুণ্যস্থান?'

'এর নাম গঙ্গাসাগর সঙ্গম।'

'গঙ্গাসাগর সঙ্গম! মুক্তি-কামীর কাম্য পুণ্য সঙ্গমতীর্থ!—হাত জোড় করে সঙ্গমের উদ্দেশ্যে প্রণতি জানায় সুলোচনা। কোন্ কামনা যেন মনে গুমরে ওঠে। ক্ষণেক নীরব থেকে সে প্রশ্ন করে, 'এ লোকালয়ের নাম কি?'

'লোকে একে সাগর-সঙ্গমই বলে। মহর্ষি কপিল এই স্থানেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে লোকের বিশ্বাস।'

'এ ক্ষেত্র কার অধিকারে?'

'সোমবংশোদ্ভব পুণ্যশ্লোক সুষেণ এই ক্ষেত্রের রাজা। তিনি ধার্মিক, দয়ালু, লোকরঞ্জক।'

'তাঁর সঙ্গে কি সাক্ষাৎ করা যায়?'

'অক্লেশে। প্রতিদিন সহস্র লোক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। প্রার্থী তাঁর কাছে বিমুখ হয় না। আপনি কি জীবিকা-প্রার্থী?'

সুলোচনা নীরব থাকে। ব্রাহ্মণ বলেন, 'জীবিকা-প্রদানে মুক্তহস্ত রাজা সুষেণ। আপনি প্রার্থনা করলেই তিনি ব্যবস্থা করে দেবেন।'

সুলোচনা ভাবে, জীবিকার জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে রাজার আশ্রয় গ্রহণ করাই সঙ্গত। কিন্তু যাচক হয়ে যাবে রাজসভায়? রাজ-কন্যা যাচ্ঞা করেনি কোনদিন। কোন কার্য সাধন করে প্রত্যুপকার প্রার্থনা করাই যুক্তিযুক্ত তাতে মর্যাদার লাঘব হবে না।

ব্রাহ্মণের নিকট বিদায় নিয়ে উপায়ের কথা চিন্তা করে সুলোচনা। সম্মুখে প্রসারিত গঙ্গাসাগর। যত দূর দৃষ্টি চলে শুধু জল আর জল। সে অথৈ জলে নয়, তীরেই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তটস্থ ভাব। তীরে থেকেও সে আশ্রয়হীন।

দিন শেষ হয়ে যায়, রাত্রি আসে। ক্রমে ক্রমে সাগরতীর জন-বিরল হয়। সুলোচনা বসে থাকে। বাঞ্ছাপূর্ণকারিণী ভগবতী গঙ্গা। তিনি কি কোন উপায় করবেন না!

সহসা দৈব যোগেই যেন উপায় উপস্থিত হল।

সুলোচনা আপন মনে নিজ অদৃষ্টের কথা ভাবছিল। হঠাৎ নৈশ আকাশ বিদীর্ণ করে এক ভীম নাদ উত্থিত হল। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ কোলাহল, 'সাবধান, সাবধান। সেই হিংস্র গণ্ডার আবার এসেছে।'

সভয়ে আর্তনাদ করে চারদিকে লোক ছুটছে। নগর রক্ষীরা অস্ত্র হাতে বেরিয়ে পড়েছে। মশালের আলোয় রক্তাল অন্ধকার।

সচকিত হয়ে বর্শা উদ্যত করল সুলোচনা। তীব্র দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাল। অতি ভীষণ হিংস্র এক গণ্ডার। খড়্গ ভ্রামিত করে উন্মাদের মত দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটছে। মশালের আলোয় ভয়ঙ্কর তার মূর্তি।

বীরাঙ্গনার ধমনীতে উষ্ণ শোনিত স্রোতের প্রবাহ। মুহূর্তে বীরসত্তা

জেগে ওঠে। আশৈশব মৃগয়ায় অভ্যস্ত সুলোচনা, শস্ত্র প্রয়োগে নিপুণ। পশু-স্বভাব তার অজানা নয়। পলকে বামে ঘুরে দাঁড়ায় বীরিণী। তারপর সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তীক্ষ্ণধার বর্শা নিক্ষেপ করে। অব্যর্থ লক্ষ্য। হঠাৎ আক্রমণে গর্জন করে ওঠে খড়্গী। পাশ ফিরতে না ফিরতে কোষমুক্ত অসির আঘাতে রক্তাক্ত দেহে সে ধরাশায়ী হয়।

কোলাহল করতে করতে ছুটে আসে জনতা, 'কে আপনি ?'

'সামান্য বিদেশী আমি, নাম বীরবর।'

'আপনি সামান্য নন। সার্থক আপনার বীরবর নাম। এই গণ্ডারকে নিহত করার জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। কেউ পারেনি। রাজা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন—

বিস্ময়ে বক্তার দিকে তাকায় সুলোচনা। নগররক্ষী বলে চলে, 'রাজা সুষেণ পুরস্কার ঘোষণা করেছেন, যিনি এই খড়্গাকে বধ করতে পারবেন, তিনি রাজকন্যাকে লাভ করবেন।

কথা বলতে পারছেনা সুলোচনা। পুরস্কার যেন নতুন বিপদের সূচনা। কন্যা সে, রাজকন্যা দিয়ে কি করবে ? হয় তো এখনি সব পরিচয় প্রকাশ করতে হবে। তথাপি সাহস অবলম্বন করে সুলোচনা। জীবন-রোমাঞ্চের শেষ সীমা দেখতে হবে।

পুরুষাকৃতি বীরবরকে অভিনন্দিত করে নগরপাল তাকে রাজসভায় নিয়ে এল। তেজোব্যঞ্জক অপূর্ব যুবকমূর্তি। সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেন রাজা সুষেণ, বললেন, 'বীরবর, আজ থেকে রাজার দ্বিতীয় আত্মা হলে তুমি।'

যথাবিধি বিবিধ উপঢৌকনসহ রাজকন্যা জয়ন্তীকে লাভ করল পুরুষবেশী সুলোচনা। বাসরকক্ষে উজ্জ্বল দীপালোক। রত্নালঙ্কারে ভূষিতা হয়ে আসছে রাজকন্যা জয়ন্তী—নববধূ। স্বর্ণপালঙ্কে কেঁপে কেঁপে উঠছে বীরাঙ্গনা বীরবর, সে আজ জয়ন্তীর স্বামী। এ যেন জীবনের চরম পরীক্ষা, বিধাতার নির্মম পরিহাস, কন্যা হয়ে স্বামীর মত সম্ভাষণ করতে হবে রাজকন্যা জয়ন্তীকে।

মধুর সুরে বেজে উঠল কঙ্কণ, সুলোচনার কানে বজ্র গর্জন করে উঠল ; কিনিকিনি বেজে উঠল মণিময় কাঞ্চী, বুক কাঁপতে লাগল সুলোচনার। নববধূকে প্রথম সম্ভাষন করতে গিয়ে কণ্ঠে বিষম খেল বীরাঙ্গনা। তারপর দ্বিধায় জড়িত কণ্ঠে বলল, 'তোমার নাম জয়ন্তী? খুব সুন্দর নাম।'

সলজ্জে নখ খুটছে জয়ন্তী, প্রথম রাগে আরক্ত হয়ে উঠেছে মুখ। সুলোচনা বলল, 'এস, জয়ন্তী এস।'

কম্পিত হস্তে রাজকন্যা জয়ন্তীকে পাশে বসাল বীরবর। তার চোখ ছাপিয়ে জল আসছে। প্রাণপণে নিজেকে দমন করছে সুলোচনা। প্রিয়ার কাছে রহস্যময় পরিচয় উদ্ঘাটিত হবেই। বাসরকক্ষে পতি-পত্নীর পরিচয় চিরকাল এমনি করেই উদ্ঘাটিত হয়। ভয়ে-আনন্দে দুটি হৃদয় কাছে আসে ; তারা পরস্পর অজানা। কিন্তু মুহূর্তেই অজানার বন্ধন কেটে যায় একটি উত্তপ্ত স্পর্শে, অচেনা চেনা হয়ে যায় একটি চুম্বনে। খিল খিল হেসে ওঠে অতি পরিচিত, অতি ঘনিষ্ঠ, চিরন্তন আত্মীয়তার সূত্রে গ্রথিত দুটি উৎফুল্ল মুখ। কে বলবে মুহূর্ত পূর্বে এরা ছিল অচেনা!

মাধব-প্রিয়া সুলোচনা নববধূর ঘোমটা খোলে। বধূ-পরিচয় করতেই হবে। বাধা দেয় লজ্জিতা জয়ন্তী।

'দেখি, দেখি'—চিবুক ধরে অতি সোহাগে আলোর দিকে জয়ন্তীর মুখ ফিরিয়ে আনে সুলোচনা। নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকে মুখের পানে। নীলনয়নে টলমল জল।

'আঃ, ছাড়—ছাড়'—স্বীকৃতা বধূর আপত্তি জাগে জয়ন্তীর কণ্ঠে। তখন জয়ন্তীকে বাহুপাশে নিবিড় করে তার কপোলে অজস্র চুম্বন এঁকে দিচ্ছে সুলোচনা। হর্ষিতা বধূর রোমাঞ্চ জাগতে না জাগতেই চমকে ওঠে জয়ন্তী, এই কি পুরুষের স্পর্শ! চোখ মেলে তাকাতেই দেখে তার স্বামীর শিথিল উষ্ণীষ ভেদ করে দেখা দিয়েছে রমণীর চূর্ণ কুন্তলজাল।

সবিস্ময়ে সে বলে, 'কে তুমি!'

হেসে বলে সুলোচনা, 'আমি রাজকন্যা জয়ন্তীর বর।'
খিল খিল করে হেসে ওঠে দুটি নবীনা যুবতী। হাসিতে, অশ্রুতে—দুঃখের কথায়, সুখের স্বপ্নে ভরে ওঠে মধুর বাসর রজনী। কথায় জয়ন্তীকে কিনে নেয় সুলোচনা।

বাইরে ওরা পতি-পত্নী, ভিতরে প্রিয়সখী। অপূর্ব এই সখীভাব—সুলোচনার পতি-চিন্তার অংশভাগী জয়ন্তী। দুইয়ের মনেই মাধবের স্বপ্ন।

কিন্তু কোথায় মাধব? সুলোচনার সঙ্কেত পেয়ে আনন্দসাগরে ভাসছিল সে। সার্থক শ্রম, সার্থক জীবন। যার জন্য বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ করে এই দূর দেশে আগমন, সে মুখ তুলে চেয়েছে। যে সঙ্কেত করেছে রাজকন্যা, বীর মাধবের পক্ষে তা সম্পন্ন করা কঠিন নয়।

পরম নিশ্চিন্তে দিবাস্বপ্নে বিভোর হয় মাধব। সে দেখে, সে ফুলময় এক বাসরে উপস্থিত হয়েছে। চারদিকে ভরা বসন্তের রাগ। ফুল হাসছে, ভ্রমর গুন্ গুন্ করছে—মধুগন্ধে ভরে উঠেছে বাতাস। সেই পুষ্পময় মালঞ্চে গন্ধপুষ্পের অপূর্ব শয্যা। চাঁদের আলোয় আলোময় কুঞ্জ। দূর থেকে ভেসে আসছে গন্ধর্বলোকের মধুর সঙ্গীত। সেই পুষ্পময় গন্ধর্বলোকে কুসুমাভরণে ভূষিতা হয়ে তারই জন্য প্রতীক্ষা করছে, তারই জীবন-প্রিয়া সুনেত্রা সুলোচনা। চাঁদের মত ঢলঢল আনন, সে আননে মলয়চন্দনের পত্রলেখা, নয়নে স্বরপ্সরীর আবেশ। কাছে যেতেই সলজ্জে উঠে দাঁড়াল সচকিতা। এগিয়ে এল মাধব। মুখ ফিরাল সুলোচনা। নবসঙ্গমভয়ে ভীতা কি বীরাঙ্গনা? হেসে সম্ভাষণ করল মাধব। চিবুক আনত করে পদে ভূমিলিখন লিখছে সুলোচনা। তাহলে কি এ অভিমান? কণ্ঠে মধু ঢেলে ডাকল মাধব, 'সু—সুলোচনা।' অশ্রুভরা চোখে তাকাল সুলোচনা। মাধব বলল, 'একি তুমি কাঁদছ?' সুলোচনা বলল, 'কেন দেরী করলে তুমি?'

'দেরী কোথায়?'—কাছে আসে মাধব। সোহাগভরে স্পর্শ করতে যায় দয়িতাকে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সুলোচনা বলে, 'ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না।' বলেই ছুটতে থাকে সে। ব্যাকুলভাবে পেছনে ছোটে মাধব, 'কোথায় যাচ্ছ? ফিরে দাঁড়াও।' নিমেষে চোখের আড়াল হয়ে যায় রাজকন্যা। পাগলের মত ডাকতে থাকে মাধব, 'সু—সুলোচনা!'—সহসা কে যেন দেহে আঘাত করে তাকে।

শয্যায় সন্ত্রস্তে উঠে বসে মাধব। শুষ্ক তর্জনী দিয়ে তার দেহে আঘাত করছে ক্রুদ্ধা মালিনী, 'একি, তুমি এখানে?'

'কেন, বিবাহ কি হয়ে গিয়েছে তার?'

ভ্রূকুটি করে বলে গন্ধিনী, 'বিবাহ হয়েছে মানে? পূর্ব সঙ্কেত অনুসারে অপহৃতাও হয়েছে সে। আমরা ভাবছি, তুমি। কে তাহলে অপহরণ করল তাকে?'

স্বপ্নের ঘোর কেটে যায় মাধবের। কঠিন বাস্তব ভূমিতে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ওঠে ব্যর্থ প্রণয়ী, 'কে অপহরণ করল তাকে?' উচ্চস্বরে ডাকল, 'প্রচেষ্ট, প্রচেষ্ট।'

প্রচেষ্ট কোথাও নেই। অদৃশ্য বেগবান তুরঙ্গ। মাধবের আর বুঝতে বাকি থাকে না। হতাশায় ভেঙে পড়ে সে। বিফল, বিফল পরিশ্রম। হাতের চাঁদ কেড়ে নিয়েছে দুশ্চেষ্ট প্রচেষ্ট। কাল্‌ঘুম পেয়েছিল তার। এ ঘুম ভাঙল কেন?

হতাশা, আক্রোশ, আক্ষেপ। পাগলের মত অস্থির মাধব। অখণ্ডনীয় বিধি-লিপি। উগ্র তপশ্চরণেও লক্ষ্মীর কৃপা হয় না, আবার বিনা তপস্যায় লক্ষ্মীশ্রী ভাগ্যবান জনকে আশ্রয় করে। বিধাতা যার ভাগ্যে যা লিখেছেন, যে বস্তু নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তাই হবে। নইলে ঘাটের কাছে এসে মাধবের নৌকাডুবি হবে কেন?

দোষ তারই, দোষ মাধবের। রাজকন্যার দোষ নেই, সে তার সত্য রক্ষা করেছে, অক্ষরে অক্ষরে সঙ্কেত বাক্য পালন করেছে। প্রচেষ্টরও দোষ নেই, অর্থলোভী ভৃত্য সে, অর্থের জন্য রাজসেবা করত। হাতের

কাছে অর্থ পেয়ে সে গ্রহণ করেছে। ভৃত্য আপন নয়, পর। প্রভুর প্রতি তার প্রণয় স্বার্থযোগে। স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলেই ভৃত্যের স্বরূপ প্রকাশ পায়, অবসর পেলেই সে প্রভুর শত্রুতা করে। প্রচেষ্টর দোষ কি ?

মাধব ভাবে, সব দোষ তার নিজের। নীচসঙ্গে অধোগতি লাভ করেছে সে। অতি নীচ প্রচেষ্ট। মাধব তাকে বিশ্বাস করেছে, মনের কথা বলেছে। তাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে মনের সাধ সাধন করতে। নীচের স্বভাব কি সে জানে না! অতি দুর্জন নীচ জন। তারা পরের দোষানুসন্ধান করে, ছিদ্র খুঁজে বেড়ায়। অন্যের প্রশংসায় তারা জ্বলে-পুড়ে মরে। বিশ্বাস করে তাদের কাছে মনের কপাট উদ্‌ঘাটন করলে, জনসমক্ষে হাসতে হাসতে সে রহস্য-কথা প্রকাশ করতে তারা দ্বিধা করে না। এই নীচের সংসর্গে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছে মাধব, সুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। মহাদেবের মত মহাযোগী—তিনিও ভূত-প্রেতের সংসর্গে নগ্ন ও ভস্ম বিভূষিত হয়ে থাকেন।

মাধবের বুক ফেটে যায়। নিজের জন্য তার দুঃখ হয় না, দুঃখ হয় দুঃখিনী সুলোচনার জন্য। মাধবের দোষে সে প্রচেষ্টর হাতে পড়েছে। অপ্সরীর মত রূপ, দেবাঙ্গনার মত গুণ। সেই কন্যা পড়ল দুষ্ট প্রচেষ্টর হাতে! এ যেন মর্কটের কণ্ঠে মুক্তামালা!

রাজকুমারী সুলোচনা কি এই দুষ্টের হাতে পড়ে সুখী হতে পারে? —পারে না। মাধব অনুমান করে, যে মুহূর্তে প্রচেষ্টকে চিনতে পারবে, সেই মুহূর্তে সে জীবন ত্যাগ করবে। নিশ্চয় শোকে ক্ষোভে আত্মহত্যা করবে সুন্দরী সুলোচনা।

মাধব সে ভয়ঙ্কর পরিণামের কথা চিন্তা করতে পারে না। নিরাশায় গর্জন করে সে, যেমন গর্জন করে পাহাড়-গুহায় বন্দী নির্ঝর। তাহলে কি কাজ এই ব্যর্থ জীবনে? সুলোচনা-শূন্য জীবন অর্থহীন। মাধব এ জীবন রাখবে না,—জীবন বিসর্জন দিয়ে নতুন জীবনে সুলোচনাকে লাভ করার চেষ্টা করবে। এই-ই একমাত্র পথ।

সঙ্কল্প স্থির করে প্রস্থানে উদ্যত হয় মাধব। গন্ধিনীর হৃদয় বেদনায় পূর্ণ হয়ে ওঠে, সে বলে, 'কোথায় চললে রাজকুমার!'

'—যেখানে দুঃখ নেই, যেখানে নতুন করে রাজকন্যার জন্য তপস্যা করতে পারি।'

ধীরে চোখের আড়ালে চলে যায় মাধব। মালিনীর মালঞ্চ খা খা করে। কাল যেখানে বসন্ত, আজ সেখানে নিদাঘের শুষ্কতা।

এদিকে সুলোচনা দীক্ষিত হয়েছে নতুন এক জীবনে। অকুল সাগরে নির্ভরযোগ্য আশ্রয় পেলে যেমন মানুষ নিশ্চিন্ত হয়, তেমনই নিশ্চিন্ত হয়েছে সুলোচনা। দুঃখের জীবনে সে সঙ্গী পেয়েছে প্রিয়সখী জয়ন্তীকে। দুঃখের মুহূর্তগুলি ভরে ওঠে রঙ্গ-কথায়।

কখনও সুলোচনা ডাকে, 'জয়ন্তী!'

'আদেশ কর প্রভু।'

'এতক্ষণ কোথায় ছিলে?'

'মালিনীর মালঞ্চে।'

'সেখানে কি?'

'নতুন এক নাগর এসেছে। যেমন রূপ, তেমনি গুণ।'

'জানো, তুমি পরপত্নী? পরপুরুষের প্রতি এ আকর্ষণ অন্যায়?'

'কি করি প্রভু, স্বামী যদি মুখ তুলে না চায়?'

'কেন, স্বামীর ভালবাসা কি তুমি পাওনি?'

'ভালোবাসা! পোড়াকপাল! তার যে এত গুণ তা কি জানতাম? লুকিয়ে লুকিয়ে আর একজনকে ভালবাসে।'

'কি করে বুঝলে?'

'সব সময় কি যেন ভাবে। অনেক রাতে বাড়ী ফেরে, কোনদিন ফেরেও না। অনেক সময় আমাকে ডাকতে গিয়ে, ভুলে তার নাম ধরে ডাকে।'

'চুপ। পতি নারীর দেবতা। পতির নিন্দা করা মহাপাপ। আর পতি বহুবল্লভ হলেও, পত্নীর পক্ষে উপপতি ভজনা করা অন্যায়।'

'শাস্ত্রের এ একচোখা নিয়ম কেন প্রভু! নারী কি মানুষ নয়? আমি এ নিয়ম মানব না। পুরুষের সাতখুন মাপ, আর নারীর পান থেকে চূণ খসলেই বিচার! আমি হাজার বার বলব আমার দয়িত মাধব।'

'জয়ন্তী, এ ভারি অন্যায়। নারীর পক্ষে স্বৈরিণীবৃত্তি সমাজ-বিশৃঙ্খলার মূল। আজ থেকে আমার কাছে তুমি প্রতি রাত্রিতে পতিব্রতার ধর্ম শিক্ষা করবে। যখনই মন চঞ্চল হবে, আমি তোমাকে মোহ-মুদ্গর শোনাব।'

দুজনেই হেসে ওঠে, যেন এক বেণীতে বদ্ধ দুই মুক্তনির্ঝরিনী।

কিন্তু এই কি সেই জীবন, যে জীবন রোমাঞ্চ-রসে উচ্ছল? মাঝে মাঝেই সঙ্গম-তীরে বসে নিজের কথা ভাবে বীরবর। কোথায় কূল? কোথায় এর শেষ? এই পরম নিশ্চিন্ততাই কি জীবন?

নিজেকে অনেকটা নিয়মেও বেঁধেছে সুলোচনা। কেমন করে যেন একটা ধারণা হয়েছে, অদৃষ্টের হাতে পুতুলের মত মানুষ। নিয়তি-চক্রে নিয়ন্ত্রিত জীবন-চক্র। সে নিয়তি অন্ধ, দুর্বার। সে মানুষের ইচ্ছাকে দেখে না, পৌরুষকে তুচ্ছ করে। একমাত্র দৈবই দৈবের বন্ধন ছিন্ন করতে পারে।

তারই জন্য যুগ যুগ ধরে তপস্যা চলেছে, সঙ্গমতীর্থে সমবেত হচ্ছে নিয়তি-পিষ্ট মানুষ। দৈবকে তুষ্ট করার প্রাণপণ প্রয়াস।

বীরবরও নিত্য প্রভাতে গঙ্গাস্নান করে। নৃত্য-গীত-বাদ্যে, বিবিধ উপচারে দেবীর পূজা করে, পুণ্যতোয়া তরঙ্গিণীর দিকে তাকিয়ে করজোড়ে প্রার্থনা জানায়, 'ওগো ভক্তবৎসলে, পূজকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, আমার মাধবকে এনে দাও।'

সুলোচনা বুঝি এও বুঝেছে, প্রেম সহজলভ্য নয়। তার জন্য ত্যাগ চাই, তপস্যা চাই—আন্তরিক নিষ্ঠা চাই। দুঃখের আগুনে পুড়ে মন

যতদিন খাঁটি না হয়, ততদিন প্রতীক্ষা করতে হয় তাকে। বিরহ সেই আগুন।

সেদিন সন্ধ্যায় গঙ্গা-সাগর তীরে একা বসে ছিল বীরবর। সন্ধ্যার ছায়ায় অস্পষ্ট সাগর জল। দূরের আঁধার-যবনিকা ক্রমে কাছে আসছে, ক্রমে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে দিগন্ত। আঁধারে শুধু শোনা যায় বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ-ভঙ্গের শব্দ, শুধু দেখা যায়, সাদা ফেনার রাশি।

নিজের জীবনেও এমনি অন্ধকার বীরবরের। আঁধারে যেন আর কিছু দেখা যায় না, শুধু শোনা যায় তরঙ্গের বিক্ষোভ। চূর্ণ জলকনার শুভ্রতা যেন কঠিন বিদ্রূপ। বীরাঙ্গনার যৌবন-মত্ততা আজ সুদূরের স্বপ্ন।

প্রণয়ে দুঃসাহস ভাল নয়, ভাবে পুরুষবেশী সুলোচনা। দুঃসাহস নিয়ম ভঙ্গ করে, স্বেচ্ছাচারী হয়, শেষ পর্যন্ত দুঃখ ডেকে আনে। পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেই দুঃসাহসী প্রেমকে বরণ করেছিল সুলোচনা। অদম্য তার পিপাসা, দুর্জয় গতি। কিন্তু কি ফল হল তার? দুঃখ, শুধু দুঃখ। বন্ধনহীন প্রেমের পরিণাম—অনন্ত নৈরাশ্য। পিতামাতার ইচ্ছায় বরবধূর জীবনে যে প্রেম গড়ে ওঠে, তাতে দুঃসাহসী প্রেমের রোমাঞ্চ নেই, মাদকতা নেই—কিন্তু তাতে শৃঙ্খলা আছে, আছে কল্যাণ; তাতে তৃপ্তি আছে, আছে শান্ত সুখ।

বীরবর সে সুখ, সে তৃপ্তি চায়নি। সে কি ভুল করেছে?—ভুল করেনি। সে জানে, যেখানে প্রেম নেই, সেখানে বিবাহও সুখের নয়। প্রেমহীন বিবাহিত জীবন বিড়ম্বনা মাত্র। সহজ সুখের মূল্যই বা কি? দুঃখের প্রাপ্তি মহার্ঘ। সহজ সুখের সঙ্গে সে প্রাপ্তির তুলনা হয় না। বীরবর জানে, মরণের মুখে জয়ের কি বিপুল আনন্দ।

সে আনন্দ লাভে বঞ্চিত হয়েছে সে। সে দোষ তার নয়, অদৃষ্টের পরিহাস নির্মম, তাই ব্যর্থ হয়েছে সুলোচনার প্রয়াস।

তবু ক্রন্দন করে ওঠে সুলোচনার হৃদয়। এ যেন অন্তরাত্মার ক্রন্দন, বন্ধ্যা নারীত্বের ক্রন্দন। নারী-জীবন ব্যর্থ হল তার। পৌরুষে কি সুখ নারীর? পুরুষের মত বীর হতে পারে নারী, পুরুষের সব অধিকার

লাভ করতে পারে নারী, কিন্তু তাতে কি আত্মার ক্ষুধা মেটে? নারীর সকল চাওয়ার অন্তরালে লুকিয়ে থাকে যে নীড়বাঁধার ক্ষুধা, সে ক্ষুধা মিটাতে পারে শুধু প্রেমিক পুরুষ! সে ক্ষুধা মিটাতে পারত মাধব। পুরুষহীন নারী অপূর্ণ।

মাধব আর আসবে না, মাধবকে আর ফিরে পাবে না সে। মিথ্যা দুঃখের তপস্যা।

কিন্তু মিথ্যা কি সঙ্গম-স্নানের পুণ্য?

সিদ্ধিদায়িনী গঙ্গা। যুগ যুগ ধরে জীবের কাম্য প্রদান করে এসেছেন তিনি। স্বর্গের করুণাধারা জীবের দুঃখে বিগলিত হয়ে মর্ত্যে নেমে এসেছে। কামনা-কল্পতরু গঙ্গা। বীরবরকে কি নিরাশ করবেন তিনি?

সহসা চম্‌কে ওঠে বীরবর।

অন্ধকারে একটি সুদীর্ঘ ছায়া মূর্তি সঙ্গম-তীরে এসে দাঁড়িয়েছে; অস্ফুটস্বরে সে বলছে, 'ভগবতি গঙ্গে, শান্তি দাও।'

কে?—ত্রস্তে উঠে দাঁড়াল বীরবর। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তার পিছনে এসে দাঁড়াল।

দীর্ণস্বরে আগন্তুক বলছে, 'তোমার বুকে স্থান দাও। মৃত্যুস্নানে শীতল হয়ে নবজীবনে প্রিয়তমাকে লাভ করি।'

এ-ও কি তাহলে হতাশ-প্রেমিক? অন্ধকারে মুখ দেখা যায় না। কিন্তু স্বর শুনে কাঁপে বীরবর।

সঙ্গমে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হল সে। পেছন থেকে বীরবর সবলে তার বাহু আকর্ষণ করল। থর থর করে নিজেও সে কাঁপছে। একি মৃত্যু-ভীতি? বীরবর মৃত্যুকে কি ভয় পেয়েছে কোনদিন?

কম্পিত কণ্ঠে সে প্রশ্ন করল, 'আপনি জীবন বিসর্জন দিচ্ছেন কেন?'

'যার চোখে আশার আলো নিবে গিয়েছে, জীবনে তার কি প্রয়োজন? যাকে আমি ভাল বেসেছিলাম, তাকে আমি পাইনি।'

'অপ্রাপ্য বলেই হয়তো তাকে পাননি। তার জন্য জীবন ত্যাগ কেন?'

বীরবরের গলা ধরে আসে, রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'আপনি যাকে ভালবেসেছিলেন, সে হয়তো আপনাকে ভালবাসেনি। নারীর চরিত্র রহস্যময়, যার প্রতি আপনার প্রীতি, সে হয়তো অন্যাসক্ত।'

'না না, তা হতে পারে না। চন্দ্রের প্রতিই কুমুদিনীর প্রীতি।'

'সে কুমুদিনীর মুখে কুহুরজনীতেও হাসি ফোটে। নারী-হৃদয় দুর্জ্ঞেয়।'

'নারী-হৃদয় দুর্জ্ঞেয় হলেও, তার মন দর্পণের মত স্বচ্ছ। আমাকেই কায়োমনোবাক্যে কামনা করেছিল সে। আমি নিজের দোষে তাকে হারিয়েছি।'

হাহাকার করে ওঠে ছায়ামূর্তি। বীরবর কথা বলতে পারে না। তার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। প্রেম ও প্রেমভঙ্গের ভাষা সর্বত্র সমান। একই আলো, একই ছায়া পড়ে সকল প্রেমিক-হৃদয়ে। অন্ধকারে বীরবরের চোখে জল চক্‌চক্‌ করে। তবু আত্মসম্বরণ করে সে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই কঠিন হয়ে উঠে বীরবর, কঠিন কণ্ঠে বলে, 'তুচ্ছ প্রেমের জন্য কেউ জীবন বিসর্জন করে না। নিশ্চয় অন্য কোন পাপ করেছেন আপনি।'

'অন্য কোন পাপ!' —শুষ্কস্বরে বলে আগন্তুক, 'জ্ঞানত আমি অন্য কোন পাপ করি নি।'

'মিথ্যা কথা। পাপের অনুশোচনাই মানুষকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে। আপনার বিচার হওয়া আবশ্যক।'

'বিচার!' —ভয়ে কাঁপে আগন্তুক।

বীরবর কথা বলে না। অন্ধকারেই তূর্যধ্বনি করে। নিমেষে রক্ষীদল এসে উপস্থিত হয়। গম্ভীর স্বরে বীরবর বলে, 'আমি গৃহে যাচ্ছি। ক্ষণেক পরে একে আমার গৃহে নিয়ে এস। বিচারে কঠিন শাস্তি দিতে হবে এঁকে।'

বীরবর নিজ গৃহের উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ করে। সম্মুখে পুণ্য সাগর-সঙ্গম। কামনা-কল্পতরু ভাগীরথী। হাত জোড় করে সে প্রণাম করে। প্রণাম করে বন্দীর দিকে তাকায়, তারপর দ্রুত অগ্রসর হয়। মাথার ওপর কত তারার আলো। তারাগুলি এত কাঁপছে কেন?

কাঁপতে কাঁপতে গৃহে প্রবেশ করে বীরবর, কম্পিত কণ্ঠে ডাকে, 'জয়ন্তী!' জয়ন্তী ছুটে আসে, সবিস্ময়ে বলে, 'একি, তুমি কাঁপছ?' জয়ন্তীর বুকে মুখ লুকায় বীরবর। জয়ন্তী বলে, 'তুমি কাঁদছ, প্রিয়সখী?' বীরবরের কান্না থামে না। উত্তাল অশ্রু-সাগর।

এদিকে নৈরাশ্যে নির্বাক আগন্তুক। নিশ্চয় সে পাপী। নইলে জননী ভাগীরথী তাকে বুকে স্থান দিলেন না কেন? অবশ্যই সে শাস্তির যোগ্য। শাস্তিই হক, বিচারে অতি কঠিন শাস্তি হক তার। ভগ্নস্বরে সে বলে, 'রক্ষি, আমায় বিচার গৃহে নিয়ে চল।'

রক্ষা পরিবৃত হয়ে বিচার-গৃহের দিকে চলে সে। চলতে চলতে দীননয়নে তাকায় সম্মুখের অনন্ত বারিরাশির পানে। এ জীবনে বিড়ম্বনার শেষ কোথায়? অশান্ত জলতরঙ্গের মত জীবন বিড়ম্বনাময়।

বীরবরের গৃহদ্বারে আসতেই পরিচারিকা এসে রক্ষীদের বলল, 'তোমরা অপেক্ষা কর। আমি বন্দীকে বিচারগৃহে নিয়ে যাচ্ছি।'

বিচারগৃহে প্রবেশ করল তারা। এই বিচার-গৃহ? অবাক হয়ে দেখল বন্দী, এ যেন দ্বিতীয় ভোগবতী। একদিকে স্বর্ণ-পালঙ্কে বহুমূল্য শয্যা, গৃহময় প্রমোদের উপকরণ। সোনার পাত্রে পুষ্পনির্যাস, সোনার থালায় রাশিকৃত ফুল। গন্ধধূপে বিলসিত কক্ষ, দীপাধারে উজ্জ্বল দীপ।

পরিচারিকা গৃহের বাইরে চলে গেল। গৃহমধ্যে বন্দী একা। যত দেখছে, তত বিস্ময়। কি বিচার হবে তার?

হঠাৎ ঘণ্টা বেজে উঠল। কে যেন উচ্চস্বরে বলল, 'বন্দী উপস্থিত।' উৎকর্ণ হল বন্দী। নেপথ্যে নূপুর-নিক্কণ শোনা গেল, শোনা গেল

কঙ্কণ-ঝঙ্কার। রহস্যময় প্রদীপালোকে গন্ধধূপে আমোদিত গৃহে প্রবেশ করল বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিতা, মহার্ঘ সজ্জায় সজ্জিতা এক নারীমূর্তি—পশ্চাতে আর একটি—

'কে! কে তুমি!' আনন্দে আবেগে চিৎকার করে উঠল বন্দী মাধব।

হাসতে হাসতে এগিয়ে এল মোহিনী মূর্তি, স্নিগ্ধস্বরে বলল, 'বীর মাধবের দয়িতা আমি, দুঃসাহসিকা সুলোচনা।'

'মিথ্যা কথা'—এগিয়ে এল জয়ন্তী, সুলোচনাকে লক্ষ্য করে বলল, 'ইনি আমার দয়িত দুঃসাহসী বীরবর।'

তখন নেপথ্যে বেজে উঠেছে শুভ-শঙ্খধ্বনি।

।। নিরঙ্কুশ ।।

বিবাহের কথা শুনে আহত ফণিনীর মত নিশ্বাস ফেলল পদ্মাবতী। কৃষ্ণবেণী সর্পপুচ্ছের মত দোল খেতে লাগল, রুক্ষ দৃষ্টিতে রোষারুণ। স্ফুরিত অধরে সখী মঞ্জুলেখাকে উদ্দেশ্য করে সে বলল, 'বিবাহের কথা কে বলেছে?'

'বলেছেন স্বয়ং বিদর্ভরাজ,—তোমার পিতা।'

'পিতা এ প্রস্তাব করতে পারেন না।'

'পারেন, কন্যা যখন পুষ্পিতা হয়।'

ক্রোধে ফেটে পড়ে পুষ্পিতা পদ্মাবতী, ক্রুদ্ধস্বরে বলে, 'পিতা জানেন, কন্যা তার নিরঙ্কুশ, সে বন্ধন চায় না।'

মঞ্জুলেখাও একথা জানে। আশৈশব স্বেচ্ছাবিহারিণী রাজকন্যা পদ্মাবতী। পিতা বিদর্ভরাজের আদরের দুলালী। স্নেহের প্রশ্রয়ে বড় হয়ে উঠেছে সে। মেরু টলে, তার ইচ্ছা টলে না। প্রাসাদে, প্রাসাদের বাইরে নির্বাধ স্বচ্ছন্দ তার গতি। বন্ধনহীন তার কুমারী-জীবন।

ভয় পেয়েছে মঞ্জুলেখা। জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মত এই রূপ। বাধা না পেলে যে-কোন মুহূর্তে দাহ্যবস্তুতে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে, নিজেও দগ্ধ হতে পারে। যৌবনবতীর সংযম বালির বাঁধ, স্বাধীনতার বিপদ পদে পদে।

উদ্ধতাকে শান্ত করতে চেষ্টা করে মঞ্জুলেখা, শান্তস্বরে বলে, 'পিতা

ভুল করেন নি সখী। ফোটা ফুলকে মালায় গেঁথে দেওয়াই যুক্তি-সঙ্গত।'

গর্জন করে ওঠে পদ্মাবতী, 'আমি মালার ফুল হতে চাই না, দুদিনে শুকিয়ে যেতে চাই না। বোঁটার ফুল হয়ে আমি ফুটে থাকতে চাই।'

'তাতে ফুলের অনেক বিপদ।'

'থাক্ বিপদ, তাতেই আমার সুখ।'

'এ সুখ আনন্দ নয় সখী! ফুল হয়ে অনেক প্রজাপতিকে আকর্ষণ করতে পারো তুমি, কিন্তু নারী বহুবীরা হতে পারে না।'

গর্জন করে ওঠে পদ্মাবতী, 'মঞ্জুলেখা!'

মঞ্জুলেখা থামে না, সে ভয় পায় না। তার সখীত্ব স্তাকবতা নয়। নির্দ্বিধায় সে বলে, 'অনেককে যারা চায়, অনেককে তারা পায় না,—একেকেও হারায়।'

ফুলে ওঠে নিরঙ্কুশ পদ্মাবতী, যেমন করে ফুলে ওঠে বাধাপ্রাপ্ত নির্ঝরিনী। কলকলস্বরে সে বলে, 'আমি অত কথা শুনতে চাইনে। তুই পিতাকে জানিয়ে দে, বিবাহ হলে অনর্থ সৃষ্টি হবে।'

মঞ্জুলেখা ধীরে ধীরে চলে যায়। পদ্মাবতীর এ উক্তিকে সে মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারে না। মঞ্জুলেখা সেই শ্রেণীর মেয়ে চিরাচরিত প্রথাকে যে শুভ বলে মনে করে। নারীত্বের সার্থকতা বন্ধনে। সে গৃহ চায়, স্বামী চায়, সন্তান চায়। বন্ধনীর মধ্যে বিচিত্রভাবে তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে নারীর জীবন, বন্ধনের মধ্যেই সার্থক হয় দয়িতা, বনিতা, জায়ার স্বপ্ন। তাই যৌবনের আবির্ভাবে নারীদেহে যেদিন সেই সার্থকতার ইঙ্গিত সূচিত হয়, সেদিন নারী উন্মুখ হয়ে ওঠে একটি স্থির বন্ধনে ধরা দিতে। স্বপ্ন-সাধকে কে পূর্ণ করতে না চায়? চায় জন্তুই,—বয়ঃসন্ধির সীমা পেরিয়ে চপলা কিশোরীর দেহে যেদিন যৌবনস্পর্শ লাগে

সেদিন সঙ্গমোন্মুখা নদীর মত তার চাপল্য মিলিয়ে যায়। আশ্চর্য এক স্তব্ধতা আসে জীবনে। যৌবনভারে ভারী দেহ, মন্দ মন্থর গতি। এ সবই ধরা দেবার নিগূঢ় কৌশল।

কিন্তু পদ্মাবতী ?

পদ্মাবতী এ স্বভাবের ব্যতিক্রম। তার অন্তরে কল্যাণী লক্ষ্মীর ধীরতা নয়, চঞ্চলা অপ্সরীর চাপল্য। অন্ধ উদ্দামতা তার দেহে ও মনে। দেহভরা রূপের নাচন, যেন ভাদ্রের ভরা কোটাল। কূলপ্লাবী তার মত্ততা। চরণে অস্থির গতি, নয়নে মদির কটাক্ষ। বিলাসবতীর বাঁকা ভ্রুযুগ মদনের উদ্যত ধনু। সে ধনু পুরুষের কাল। শৃঙ্গারালঙ্কারে নিরন্তর ভূষিতা হয়ে সে কিঙ্কিনী-ঝঙ্কারে ও কাঞ্চী-দোলায় অনঙ্গ-আবাহন জানায়। সে ভয় পায় না। বিষম স্মরগরল নিয়ে হেলায় খেলা করে অনূঢ়া মদোদ্ধতা।

এ মত্ততা প্রশ্রয় পেয়েছে পিতার স্নেহে। স্নেহান্ধ পিতা কন্যার ইচ্ছার বিরোধিতা করেন নি কোনদিন। নিজে অরণি হয়ে তিনি স্বেচ্ছাচারিতার আগুন জ্বালিয়ে রেখেছেন। অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি বিদর্ভরাজ সত্যকেতু, অমিত শক্তিধর। এই ঐশ্বর্য ও শক্তির গর্ব তিনি সংক্রামিত করে দিয়েছেন নন্দিনীর স্বভাবে। রূপ গর্বিতা, ঐশ্বর্য-গর্বিতা রাজার দুলালী পদ্মাবতী,—আজন্ম নিরঙ্কুশ।

'আজ আমি বন-বিহারে যাব'—বলে উঠল কিশোরী কন্যা। রাজা বললেন, 'নিশ্চয় যাবে। অনেক বন বিদর্ভের অধিকারে।' সেজে এল সখী দল। সজ্জিতা হল রাজহস্তী। কিংখাবের হাওদায় হেলে দুলে বন-বিহারে চলল রাজার নন্দিনী।

অর্জুন-শাল-দেবদারু-তমালে ঘেরা নিবিড় বন। মাঝে মাঝে বন-গুল্মঞ্চ আর মধুপর্ণী লতার বন্ধন। কিশোরী পদ্মাবতীর চঞ্চল চরণ-চাপে ছিঁড়ে যায় লতার বন্ধন। বনভূমি মর্মরিত হয়; গাছে গাছে

কম্পন জাগে। চপলা রাজবালার ক্ষণ-বিলাসে মুহূর্তে শ্রীহীন হয় অরণ্য শ্রী; ছিন্নপত্র শাখা, ছিন্নশাখ বৃক্ষ—যেন নির্মম দস্যুতার গ্রাস অরণ্য-প্রকৃতি।

খুসী হয়ে ফিরে আসে উচ্ছল পদ্মা। রাজা সস্নেহে শুধান, 'কি দেখলে বনে?'

বেনী দুলিয়ে বলে রাজনন্দিনী, 'বনে দেখে এলাম সুন্দর সরোবর। আমি জল-বিহারে যাব।'

রাজা বললেন, 'যাবে বই কি! জল-বিহার রাজবালাদেরই যোগ্য বিহার।'

পরদিন প্রভাত হতে না হতেই এল রাজভবনের সৈরিন্ধ্রী। হরিদ্রা-গোরোচনা-বেসনের উদ্বর্তনে উদ্বর্তিতা, ভৃঙ্গরাজ-কালাগুরুর অনুলেপনে অনুলিপ্তা রাজকন্যা সখীসঙ্গে চলল জল-বিহারে।

স্বচ্ছ জলে সহস্র পদ্ম। রাজহংসী খেলা করছে হংসলীলায়। তারই মধ্যে শুরু হল উদ্দাম জলকেলি; মুহূর্তে নিস্তরঙ্গ সরোবর তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল। পক্ষ বিধূনিত করে রাজহংসী সরে গেল দূরে। মত্তা করভীর মত কমলবনে প্রবেশ করল কিশোরী। তছনছ সুশোভন পদ্মবন।

এমনি করে ইচ্ছার দুয়ার খুলে গেল পদ্মাবতীর। ইচ্ছা স্বেচ্ছা-বিহারে পরিণত হল। আজ বন, কাল পর্বত, তারপর দিন তড়াগ। প্রাসাদে, তড়াগে, বনে, পর্বতে স্বেচ্ছায় বিচরণ করে স্বেচ্ছাধীনা। বাধা সে পায় না, বাধা কেউ দেয় না। মুক্ত আনন্দে, উচ্চ কলহাস্যে মুখর প্রাসাদ, বন, তড়াগ, পর্বত।

শৈশব-সঙ্গী পুরুষ-কুটুম্বেরও অভাব ছিল না পদ্মাবতীর—ক্রমিল, গোভিল ও আরও অনেকে। তারাও স্বাধীনভাবে পদ্মাবতীর সঙ্গে হাসত, খেলত—বন-বিহার, জলবিহারের সহচর হত। কিশোর-কিশোরীর সে খেলায় কেউ সংশয় প্রশ্ন করত না। সুকুমার কমলবনে—কে পদ্ম, কে পদ্মিনী?—সব ফুল সরল, সব ফুল সমান।

পদ্মাবতীর অন্যতম প্রিয় সহচর সৌভকুমার দ্রুমিল। মায়াধর দানবের বংশে তার জন্ম। আশ্চর্য সুন্দর রূপ! তার দেহে নব মেঘের নীলাঞ্জন, নয়নে নীলতারার খেলা। কি জানি কেন, তাকে দেখলেই প্রগল্‌ভা হয়ে উঠত কিশোরী পদ্মাবতী। বন-বিহারে প্রধান সঙ্গী হত সে। জল-বিহারে ঝামর জলের ঝাপটায় পদ্মাবতী তাকে অস্থির করে তুলত।

'আঃ, লাগছে—চোখে জল লাগছে'—দুই হাতে চোখ ঢেকে কাতরকণ্ঠে বারণ করত দ্রুমিল।

জলখেলায় উদ্দাম পদ্মা কলোচ্ছ্বাসে হেসে উঠত। দুই হাতে জলের ঝালর তৈরি করে এগিয়ে যেত দ্রুমিলের দিকে। কোন বারণ শুনত না। দেহে শিশু-রক্তের নাচন, মনে শিশু-প্রকৃতির মাতন। দ্রুমিলের হাত ধরে দ্রুত গভীর জলের দিকে টেনে নিয়ে যেত তাকে। দেহের হুটোপুটিতে লুটোপুটি জলতরঙ্গ। ঝপ্‌ঝপ্‌, ঝরঝর শব্দে খিল খিল হাসির তরলতা।

জলে চুবন খেয়ে ঢোক গিলত দ্রুমিল, হেসে হাততালি দিত প্রমত্তা পদ্মা।

'দ্রুমিল! দ্রুমিল!'—অরণ্যতলে ছুটে চলত এক আবেগ-কম্পিত কণ্ঠ। দ্রুত ছুটে চলেছে পদ্মাবতী। আজ তাদের লুকোচুরি খেলা। কোন্ অরণ্য-দ্রুমের অন্তরালে লুকিয়ে আছে দ্রুমিল। তাকে খুঁজে বের করতে হবে। নইলে পদ্মার পরাজয়। তার চরণে বন-হরিণের গতি, বেণীতে বেতসী লতার দোল। রাজ-নন্দিনী সে, পরাজয় স্বীকার করতে পারে না।

পেছন থেকে সহসা চোখ চেপে ধরত দুটি কোমল কর। মুহূর্তেই বুঝতে পারত পদ্মা, 'ছাড়, ছাড়!'

'বল, কে আমি?'

পদ্মা যাকে মনে করেছিল, সে নয়। এ অন্য কণ্ঠস্বর। সংশয়াম্বিত পদ্মা :

'কে, গোভিল ?'

'উহুঁ।'

'কে, মঞ্জুলেখা ?'

'উহুঁ।'

'বুঝেছি, তুমি দুষ্ট ক্রুমিল।'

চোখ ছেড়ে হাসত ক্রুমিল, হাঁফ ছেড়ে হাসত পদ্মা। আশ্চর্য! ক্রুমিল এমন করে অন্যের স্বর অনুকরণ করতে পারে! মায়াধর ক্রুমিল।

ক্রুমিলের হাত ধরে অনুনয় করত পদ্মা, 'এ কৌশল আমায় শেখাতে হবে।'

পদ্মার স্কন্ধে হাত রেখে বলত ক্রুমিল, 'একদিন শেখাব।'

ক্রুমিলের এ স্পর্শে চমকে উঠত না পদ্মা। কিশোর-কিশোরীর মিলনে আবেগ আছে, কোন গূঢ় অনুভূতি নেই; এ ছোঁয়ায় মাধুর্য আছে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নেই। এ স্পর্শে শিশুদেহে আগুন জ্বলে না, রক্তে দুরন্ত কম্পন জাগে না, উত্তাপহীন অবোধ শিশুর স্পর্শ।

একদিন আগুন লাগল পদ্মাবতীর রক্তে।

কিশোরী তখন নব-যৌবনে পদার্পণ করেছে। কলায় কলায় পূর্ণ হয়ে উঠছে চাঁদ। পদ্মাবতী বুঝতে পারে, কোথা থেকে কিসের যেন পরিবর্তন আসছে দেহে। মত্ত সাগরে বান ডেকেছে বুঝি। কিন্তু ঠিক ধরতে পারে না, বুঝতে পারে না। কিশোরীর মত তেমনি দুরন্তপনা, তেমনি চাপল্য। তেমনি দাপাদাপি বনে, পর্বতে, তড়াগে।

রূপের জ্যোৎস্নায় আলোকিত বন, পর্বত, তড়াগ—আলোড়িত যুবক-মন। ভ্রূক্ষেপ নেই পদ্মাবতীর। দুকূল শিথিল হয়, খেয়াল

থাকে না, ওড়না অংসস্খলিত হয়ে পড়ে—সতর্ক হয় না। তেমনি কিশোরীর মত মুগ্ধতা, তেমনি তরলতা।

মন্ত্রমুগ্ধের মত আসে গোভিল। সে কুবেরানুচর। পদ্মার দিকে তাকিয়ে সে স্তুতি করে, 'পদ্মা, তুমি শিবপ্রিয় পার্বতী, তুমি বিষ্ণুবক্ষো-বিলাসিনী লক্ষ্মী।'

হেসে বলে পদ্মা, 'আরো কিছু?'

'তুমি উর্বশী, তুমি রোহিণী।'

খিল খিল হাসে পদ্মা। আরও প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে গোভিল। তার স্তুতি দেবী-বন্দনাকে ছাড়িয়ে যায়, 'পদ্মা আকাশের চাঁদ, পুরুষের মানস-হংসী।'

বিহ্বল গোভিল। পদ্মা ঠিক বুঝতে পারে না, কেন এই স্তুতি, কেন এই বন্দনা? কিন্নরী-লীলায় সে হাসে। এ স্তুতি শুনতে ভাল লাগে তার। সে বুঝি উর্বশী, কিংবা রোহিণী।

কখনো আসে দ্রুমিল। এখন সে নবীন যুবক। সে চপল নয়, ধীর। সে কলানিপুণ, শাস্ত্রজ্ঞ। দানব হলেও জ্ঞানীর মত তার আচরণ। আগের মত নিঃসঙ্কোচে সে পদ্মাকে স্পর্শ করতে পারে না। কোথায় যেন বাধা, কিসের যেন বিচার। চুম্বকের মত আকর্ষণ পদ্মার অঙ্গসজ্জায়, আর অঙ্গরাগে। মোহ-বিহ্বল দ্রুমিল মুগ্ধের মত শুধু তাকিয়ে থাকে।

সকৌতুকে বলে পদ্মা, 'কি দেখছ?'

'দেখছি তোমার রূপ। তুমি সুন্দর।'

আঁচল দুলিয়ে বলে পদ্মাবতী, 'উঁহু। তার চেয়ে বেশি সুন্দর ওই স্বর্ণালী সন্ধ্যা। দেখ কত বিচিত্র তার বর্ণ।'

দ্রুমিল আকাশের দিকে তাকায়। খিলখিল হেসে ওঠে পদ্মা। দোলে বক্ষোহার, দোলে মণিময় কাঞ্চী। এত বোকা দ্রুমিল।

'কম্পিতকণ্ঠে ডাকে দ্রুমিল, 'পদ্মা!'

বনতলে মিলিয়ে যায় পদ্মার প্রগল্‌ভ সহাস্য কণ্ঠ, 'দ্রুমিল দ্রুম্—দ্রুমিল দ্রুম্।'

বন প্রতিধ্বনিত হয়। ছুটতে গিয়েও স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকে দ্রুমিল। দানব সে, কামার্ত, কিন্তু জ্ঞানী সে, বিধাতার দাস। পদ্মা প্রগল্‌ভা হলেও, পাপ নেই তার মনে। সরলতাকে সে আঘাত করতে পারে না। নিজের অন্তরে জ্বলে মরে দ্রুমিল। উন্মাদনায় তার শান্ত চক্ষু উগ্র হয়ে ওঠে।

শঙ্কিতা হয় সখী মঞ্জুলেখা। দ্রুমিলের এ দৃষ্টিকে চেনে সে। এ সেই যৌবন, যে মুহূর্তে বিভ্রাট ঘটাতে পারে। সে বলে, 'সখী, এ আগুন নিয়ে খেলা।'

'কোথায় আগুন?'

'আগুন তোমার দেহে, আগুন ওদের মনে।'

মুগ্ধার মত হাসে পদ্মা। যৌবনারূঢ়া হলেও যৌবনকে জানে না সে, চেনেনি তখনো।

উত্তেজিত হয়ে বলে মঞ্জুলেখা, 'মনে রেখো,—অশাস্ত যৌবন, অশাস্ত যুবক-যুবতীর মন। সতর্ক থাকলেও তারা বিশ্বাসভঙ্গ করে।'

উচ্চহাস্যে হেসে ওঠে পদ্মাবতী, যেন প্রদীপ্ত সুরা। যৌবনমত্তা শাসন মানে না। অবিশ্বাসের ঝড়ে উড়িয়ে দেয় মঞ্জুলেখাকে।

সেদিন সংযামুন পর্বতে বিহারে বেরিয়েছে পদ্মাবতী। সারাদিনের মত্ততা গিয়েছে দেহের ওপর দিয়ে। অপরাহ্নেও উচ্ছল পর্বতসানু। বাসন্ত অনিলে আন্দোলিত দ্রুমশাখা, প্রগল্‌ভ রক্তাশোকের গুচ্ছ। কল্‌কল্ খল্‌খল্ শব্দে সখীরা হাস্যকৌতুকে মত্ত।

সহসা যেন স্তিমিত হয়ে পড়েছে পদ্মাবতী। মনে অজানা ব্যাকুলতা। রক্তাশোকের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। অশোক কেন এত লাল! কোকিল-কূজনে কিসের আকূতি? কান পেতে শুনতে থাকে পদ্মা।

অদূর পর্বত থেকে ভেসে আসছে মধুর বীণাধ্বনি, ষড়্‌জাদি মূর্ছনায়

কেঁপে কেঁপে উঠছে স্বরগ্রাম। কম্পিত শিলা-সানু। অদ্ভুত তান, মান, লয়।

সম্মোহিতের মত ছুটে চলে পদ্মা।

কে? মঞ্জুলেখা? ঠিক যেন মঞ্জুলেখা। এলোচুল পিঠে এলিয়ে পেছন ফিরে একমনে বীণা বাজাচ্ছে মঞ্জুলেখা। তার কাছে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে ভুবন, ভুবনের কোলাহল।

কৌতূহলী এগিয়ে চলে পদ্মা। সামনে আসতেই ভুল ভেঙে যায়। মঞ্জুলেখা নয়, মায়াধর দ্রুমিল। দানব দ্রুমিল—নিকৃতি-নিপুণ। সে ইচ্ছানুরূপ বেশ ধারণ করতে পারে, ইচ্ছামত অন্যের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করতে পারে। চতুঃষষ্ঠি কলায় পারদর্শী সে। বীণাবাদনে দক্ষ। দ্রুমিল বীণা বাজাচ্ছে একান্তে, একমনে।

কৌতুকে এগিয়ে আসে পদ্মা। চুপিসারে দ্রুমিলের দেহ ঘেঁষে বসে। খেয়াল নেই দ্রুমিলের। তন্ময় সুর-সাধক। সুর সাধনায় বীণাতন্ত্রে উঠছে অপূর্ব কম্পন।

সহসা বীণাধ্বনি থেমে যায়। স্তব্ধ পদ্মাবতী। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দ্রুমিলের দিকে। কেমন যেন আবেগ-বিহ্বলতা। কি যেন সে চায়।

দ্রুমিল পদ্মার হাতখানি নিজের হাতে তুলে নিল। বাধা দিল না পদ্মা। সে সম্মোহিতা। দুরু দুরু কাঁপছে বুক। দ্রুমিলের অতি কাছে এসেছে দেহ, মুখের অতি কাছে এসেছে মুখ।

সহসা দেহে এক মাদক স্পর্শ অনুভব করে পদ্মা।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত পিছিয়ে যায় সে। শিরায় শিরায় অদ্ভুত কম্পন, যেন ভূমিকম্পে কাঁপছে দেহ, দেহের রক্তকণা। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নৃত্য করছে অঙ্গে অঙ্গে, যেন ঝড়ের ঝাঁকুনিতে জেগে উঠেছে এক ঘুমন্ত সত্তা।

কিন্তু পরমুহূর্তেই কঠিন হয়ে ওঠে পদ্মা। তীব্রস্বরে ডাকে, 'দ্রুমিল!'

বীণাখানি হাতে নিয়ে দ্রুমিল তখন অতি দ্রুত মিলিয়ে যায়

সাম্নু-ক্রমের অন্তরালে। মায়াধর দানব ক্রমিল, জ্ঞানীভাবেই দানব-বুদ্ধিতে বিচরণ করে সে। প্রগলভা যৌবনবতীকে সে আগ্নিস্পর্শ দিয়েছে।

মদন-দীপলতার মত কাঁপতে কাঁপতে সখী-সঙ্গে ফিরে এল পদ্মা।

সে রাত্রে ঘুম হয়নি পদ্মাবতীর। ক্রমিলের প্রতি ঘৃণা জেগেছে, কিন্তু তার চিন্তাকে দূর করতেও পারে নি। এ স্পর্শ নতুন, এ স্পর্শ অননুভূত। এই কি মঞ্জুলেখার সেই আগুন? বিনিদ্র চোখে রক্তাল আকাশের স্বপ্ন। নক্ষত্রগুলি যেন অগ্নিস্তূপে পরিণত হয়েছে, আগুন লেগেছে গ্রহে গ্রহে। সেই আগুনের মধ্য দিয়ে যাত্রা করছে পদ্মাবতী। তার পা মাটিতে নয়, ঊর্ধ্বে—অনন্ত শূন্যে। আগুনের স্পর্শে নতুন চেতনায় জেগে উঠেছে যুবতী, সে চেতনায় শঙ্কা, ভয়, আনন্দের দুরন্ত দোল।

সেইদিন বুঝল পদ্মা, সে আর কিশোরী নয়। দেহে তার অনন্ত সম্ভাবনা, অজস্র আকর্ষণ। বর্ণে, সৌরভে প্রস্ফুটিতা পদ্মিনী। আজ সে ভ্রমরের লক্ষ্য। প্রজাপতির দৃষ্টি পড়েছে তার ওপর। এবার ঝাঁকে ঝাঁকে আসবে ভ্রমর, বিচিত্র বর্ণের পাখা মেলে লাখে লাখে আসবে প্রজাপতি। সে আকর্ষণ করতে পারে, অনেককে আকর্ষণ করতে পারে।

স্বাধীনা যুবতীর এই প্রথম সচেতন অনুভূতি,—প্রচণ্ড শক্তির আধার সে। সে বিদ্যুৎ, হেসে সে বজ্র হানতে পারে; সে প্রচণ্ড অগ্নিশিখা, মুহূর্তে প্রলয় সৃষ্টি করতে পারে।

অগ্নিস্পর্শে নতুন জীবনে জেগে উঠল প্রমত্তা পদ্মা।

পিতা স্নেহান্ধ, কিন্তু সজাগ মাতার দৃষ্টি। স্বামীকে একান্তে ডেকে তিনি সাবধান করে দেন, 'এবার পদ্মাকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ কর।'

'কেন?'—প্রশ্ন করেন সত্যকেতু।

'কিশোরী এখন যুবতী হয়েছে। দেখছ না দেহের জোয়ার?' হেসে মহিষীর কথা উড়িয়ে দেন বিদর্ভরাজ। স্নেহের দুলালী কন্যা—তার স্বাধীনতায় বাধা দিতে পারেন না তিনি। মুক্ত বিহঙ্গকে বন্দী করতে পারেন না বদ্ধ খাঁচায়। উদার বিদর্ভরাজ।

মহিষী বলেন, 'কৈশোর অবধি কন্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায়। তারপর কঠিন হতে হয়, কঠিন নিয়মে তাকে বাঁধতে হয়। যৌবনবতীর স্বেচ্ছাবিহার শুধু অশোভন নয়, বিপজ্জনক।'

রাজা বলেন, 'বিপদ তাদের, যারা দুর্বল। সত্যকেতু-নন্দিনী সবলা।'

'আগুন সবলা-অবলা বিচার করে না।'

'করে। অগ্নিশুদ্ধ বিদর্ভকুল। তা ছাড়া কিই এমন বয়স পদ্মার!'

ক্রুদ্ধা হয়ে ওঠেন রাজমহিষী, ক্রুদ্ধস্বরে বলেন, 'স্নেহ বয়সকে চিরকাল ছোট করেই দেখে। পদ্মা ছোট নয়। তার শিক্ষা বিষয়ে পিতার নির্মোহ হওয়া উচিত। প্রশ্রয় পেয়ে সে অনেক বেড়েছে, এবার তাকে তাড়না করা উচিত।'

নিস্পৃহ কণ্ঠে বলেন বিদর্ভরাজ, 'পদ্মাকে আমি তাড়না করতে পারি না।'

'কন্যা যদি ভ্রষ্টা হয়, নষ্টা হয়?'—তারস্বরে বলেন মহিষী।

সন্নত মস্তকে দাঁড়ান বিদর্ভরাজ। গর্বোন্নত মণিময় মুকুট। অধর-কোনে অবজ্ঞার হাসি টেনে তিনি বলেন, 'চন্দ্রে যদি কলঙ্ক স্পর্শ করে, ঐশ্বর্য দিয়ে বিদর্ভরাজ সে কলঙ্ক ঢেকে দেবে।'

মাতা শঙ্কিতা হন। পিতার প্রশ্রয়ে নিরঙ্কুশ পদ্মাবতী। সে নিঃশঙ্ক। মুক্ত ছন্দে সে বিহার করে বনে-উপবনে, তরল তরঙ্গে। নিজের সম্বন্ধে সে অচেতন নয়, সচেতন। দেহে তার প্রচণ্ড শক্তি, প্রচণ্ড আকর্ষণ—ঐরাবতকে সে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

সে এও জানে, সে আজ পুষ্পিতা। তার অন্তরে সঞ্চিত মধুভাণ্ড ঃ এই মধুর সন্ধান সে জানিয়ে দেয় শ্লথবিন্যস্ত দুকূলে, অংসস্খলিত ঊর্ধ্ববাসে—অঙ্গরাগে, আর বঙ্কিম কটাক্ষে। পাগল-করা রূপসজ্জা, পাগল-করা সঙ্কেত। পুষ্পগন্ধে পাগল বন, পাগল ভ্রমর, পাগল প্রজাপতি।

উন্মাদ হয়ে ছুটে আসে মদ্রকুমার, মৎস্যরাজ। তারা মধুলোভী মধুকর। মাধুকরী দেয় পদ্মা,—একটা মদির দৃষ্টি, একটু মধুর হাসি। প্রসাদ পেয়ে প্রসন্ন হয় তারা। তারা আরো প্রত্যাশা করে। ব্যঙ্গ হাস্যে তখন গভীরবনে মিলিয়ে যায় কলকণ্ঠী পদ্মা।

কখনো আসে গোভিল,—স্মরবিহ্বল নেত্র, মদবিহ্বল কণ্ঠ, 'পদ্মা, নন্দনবনের পারিজাত তুমি, মুনির মানস-হংসী।'

খিল খিল করে হেসে ওঠে পদ্মা।

'গোভিলের চোখে শিকারীর সন্ধান। পদ্মা এ-দৃষ্টিকে এখন ভাল করেই চেনে। চঞ্চল চরণে নিমেষে বনান্তরে মিলিয়ে যায় হরিণাক্ষী। বৈদ্যুতাহত গোভিল।

পদ্মাবতা ধরা দেয় না। সে আকর্ষণ করে, মোহিত করে—নিজে আকৃষ্টা হয় না, মোহিতা হয় না। ফুলের মত সে বর্ণসৌরভ বিস্তার করে। মাতাল হয় ভ্রমর, মৌমাছি, প্রজাপতি। উন্মাদের মত যখন ছুটে আসে তারা, তখন আকাশের ফুল হয় পদ্মা। উদ্দাম তার চাপল্য, অদম্য কৌতূহল। ব্যাধিনীর মত সে ফাঁদ পাতে, শিকার ধরে না। বীতংসে বন্দী করে বন্ধন খুলে দেয়।

কি আনন্দ আছে বন্ধনে? ওই আকাশ-বিহঙ্গ, ঊর্ধ্বে, অনন্ত ঊর্ধ্বে উঠছে সে। সে আনন্দিত। ওই পাহাড়ী ঝর্ণা—মুক্তবন্ধ, স্বচ্ছন্দ শুভ্র স্ফটিক জল। সে আনন্দিত। স্বাধীনতায় সুখ, সুখ এই স্বেচ্ছা-বিহারে। ভোগেও সুখ নেই, সুখ সম্ভোগে। না-থামা ছন্দে নাচা, আর নাচানোই সুখ, সুখ সাগর-দোলার নাগর-দোলায়।

ভীতা মাতা স্বামীকে বলেন, 'তুমি কি অন্ধ হলে?'

বিদর্ভরাজ বলেন, 'কেন?'

'কন্যাকে পাত্রস্থ কর।'

'আর কিছুদিন যাক।'

ক্রুদ্ধস্বরে বলেন মহিষী, 'পর্বকালে স্বাধীন জোয়ারের নদী যদি কূল ভাঙে, সে দায়িত্ব তোমার।'

রাজা এবার ভয় পান। অনুসন্ধান করে তিনি বিবাহ স্থির করেন।

মর্ত্যে অপ্রতিম রূপ পদ্মার। তার পাণিপ্রার্থী অনেকে। কিন্তু বিদর্ভরাজের কাছে যোগ্য মনে হয়, মাথুরমণ্ডলের অধীশ্বর নৃপতি উগ্রসেনকে। উগ্রসেন পরবীরঘাতী, কিন্তু পরম ভাগবত, তিনি দাতা ও ভোক্তা। ঐশ্বর্যে ও ঔদার্যে তিনিই পদ্মার যোগ্য বর। প্রীতিমান্ ধীমান উগ্রসেন। কিন্তু ক্ষেপে ওঠে পদ্মা, যেন পাগলাঝোরা। সখীকে বলেও সোয়াস্তি পায় না, সে নিজেই ছুটে আসে, 'পিতা!'

হেসে বলেন বিদর্ভরাজ, 'কি মা?'

'তুমি আমায় পর করে দিতে চাও?'

'কে বললে? বিবাহে কন্যা পর হয় না। বিবাহ দুইকুলের বন্ধনকে দৃঢ় করে।'

উচ্ছল হয়ে ওঠে পদ্মা, বলে, 'ইচ্ছামত আমি তোমাদের দেখতে পাব না। পিতার কাছ থেকে আমাকে বিদায় নিতে হবে।'—পদ্মা বুঝি অশ্রুমুখী।

বিদর্ভরাজ ব্যথিত হন। তিনি স্নেহান্ধ। কন্যাকে ছেড়ে কখনো থাকেন নি। আত্মসংবরণ করে তিনি বলেন, 'কেন? কন্যা যখনি স্মরণ করবে, পিতা কন্যার কাছে ছুটে যাবে—যখন ইচ্ছা হবে, নন্দিনী তখনই পিতৃভবনে আসবে। এই সর্ত করেই আমি বিবাহ দেব।'

'পরের ভবনে বিদর্ভ-নন্দিনীর স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে।'

'মিথ্যা কথা। স্বাধীনা তুমি, চিরস্বাধীনা থাকবে। বিবাহের পবিত্র মন্ত্র এই কথাই বলে, বধূ সংসারের সম্রাজ্ঞী। তুমি শ্বশুরের ওপর

সম্রাজ্ঞী হবে, শ্বশ্রূর ওপর সম্রাজ্ঞী হবে, স্বামীর ওপর সম্রাজ্ঞী হবে। তোমার ইচ্ছাই হবে রাজার ইচ্ছা।'

বিদর্ভরাজ সত্যকেতুর কণ্ঠস্বর ক্রমে গম্ভীর হয়ে ওঠে, যেন জলভরা মেঘ। নন্দিনীর স্বভাব তিনি জানেন। যত স্বেচ্ছাচারিণীই হক, পিতাকে সে ভালবাসে, পিতার মনে সে আঘাত করতে পারে না। সেইভাবেই তিনি বলেন, 'পুত্রি, পিতার কর্তব্য সন্তানকে পালন করা, কন্যা বিবাহযোগ্যা হলে তাকে যোগ্য পাত্রে অর্পণ করা। যে পিতা তা না করে, সে কর্তব্যভ্রষ্ট হয়। তুমি কি পিতাকে কর্তব্যভ্রষ্ট করতে চাও? আমি প্রতিজ্ঞা করছি, পতিগৃহে আমার কন্যার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হতে দেব না। পিতৃগৃহের সুখ থেকেও বঞ্চিতা হবে না নন্দিনী। যে-কোন উপায়ে হক, নির্বন্ধ করে আমি কন্যাকে নিজের কাছে নিয়ে আসব।'

উদ্ধতা আর প্রতিবাদ করতে পারে না। কিন্তু বন্ধনকে স্বীকারও করতে পারে না সে। একটা চাপা বিদ্রোহ মনের মধ্যে গুম্‌রাতে থাকে। একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে শুধু পিতার মুখ চেয়ে পতিগৃহে আসে পদ্মা।

সঙ্গে প্রচুর উপঢৌকন, রূপ, আর গর্ব। বিদর্ভরাজ কন্যার বিবাহে ঐশ্বর্য ঢেলে দিয়েছেন, আর পদ্মাবতীর নিজের আছে উদ্ধত যৌবন। পাগল প্রতাপবান্ উগ্রসেন। নববধূকে সুখী করবার জন্য উদ্‌গ্রীব তিনি, ভেবে পান না কি করবেন। মানী পিতার মানিনী কন্যা। পদ্মার প্রেমের জন্য তিনি প্রাণ দিতে পারেন।

কিন্তু পদ্মা? পতিগৃহের সমাদরে তার মন ওঠে না, পতির আদরে বিরূপ রূপবতী। কুঞ্জ-বিহারে এসে সে বিষিয়ে ওঠে, একটা সুকঠিন কাঠিন্য। এই সেই স্বাধীন বন-বিলাস? সতর্ক পাহারা তার চারদিকে,—দাসদাসী, পরিকর-পরিজন। প্রমোদ-সরোবর প্রাকারে ঘেরা। মনে মনে গর্জাতে থাকে বন্দিনী।

উগ্রসেন চোখে অন্ধকার দেখেন। ধীর আজ অধীর। সম্মুখে রূপের সুধা-সাগর, তিনি বিন্দুপানে বঞ্চিত। পত্নীর মুখপানে চেয়ে আকুল আগ্রহে তিনি বলেন, 'আমার রাজ্য, ঐশ্বর্য—সবই তোমার প্রিয়তমে!'

প্রলয় মেঘের ছায়া ঘনায় পদ্মার মুখে, সে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

পাগলের মত বলেন প্রতাপবান্ উগ্রসেন, 'সুন্দরী, আমি তোমার দাস। আজ্ঞা কর, বল, কিসে তোমার সুখ?'

উগ্রস্বরে বলে পদ্মা, 'কিসে সুখ বনবিহঙ্গের?'

অবাকমুখে তাকান উগ্রসেন।

রক্তাক্তলোচনে বলে প্রগল্ভা পদ্মা, 'আমায় পিতৃভবনে পাঠিয়ে দাও, বন্দী বিহঙ্গী স্বর্ণ-পিঞ্জরে সুখ পায় না।'

'তোমাকে ছেড়ে কেমন করে থাকব আমি?'

বিষোদ্গার করে মদোদ্ধতা, 'রাজপুরীতে বিলাসিনীর অভাব নেই।'

হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায় উগ্রসেনের। তিনি ধর্মধীর গৃহমেধী। তাঁর কাছে পত্নীই গৃহের একক কামধেনু। স্বপ্নেও অন্য নারীর সঙ্গ কামনা করেননি তিনি। প্রিয়ার কথায় তিনি মর্মাহত হন। মনকে এই বলে প্রবোধ দেন, বিবাহের পর মাতাপিতার বিরহে দুঃখিতা কন্যা পিতৃভবনকেই সমাদর করে। কিন্তু এ আদর দুদিনের। দুদিন পরেই স্বামীর গৃহ প্রিয়তর হয়ে ওঠে। প্রেমিকা কল্যাণী বধূ সেদিন পিতৃগৃহকে ভুলে যায়। উগ্রসেন ধৈর্য ধরে সেইদিনের প্রতীক্ষা করবেন।

ইতিমধ্যে বিদর্ভরাজের কাছ থেকে প্রচুর উপঢৌকন সহ আসে সন্দেশ-বহ। প্রীতির যৌতুকে জামাতাকে তুষ্ট করে বিদর্ভরাজ দূত পাঠিয়েছেন, লিখেছেন,—'পিতা নববিবাহিতা পুত্রীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল। বিবাহের পর কন্যা পিতার নয়, পতির। কিন্তু স্নেহ অতি বিষম। প্রিয়জনের এই প্রীতি-স্নেহের কথা স্মরণ করে জামাতা যেন কিছুকালের জন্য পিতার দর্শনার্থ কন্যাকে প্রেরণ করেন।'

পত্নীর ক্ষণ-বিরহও উগ্রসেনের নিকট দুর্বহ। পদ্মা বিরক্ত হলেও

পরম অনুরক্ত উগ্রসেন। তথাপি স্নেহকাতর পিতার সনির্বন্ধ অনুরোধকে উপেক্ষা করতে পারেন না প্রীতিমান ধর্মধীর। নবপরিণীতা পত্নীকে তুষ্ট করার জন্যও বটে, আর স্নেহকাতর পিতার মর্যাদা রক্ষা করার জন্যও বটে—নিজের দুঃখ ভুলে, নববধূকে পিতৃগৃহে প্রেরণ করেন উগ্রসেন। বধূর মুখের মধুর হাসি কোন্ বঁধুর কাম্য নয়?

পিতৃগৃহে ফিরে এল পদ্মাবতী। পিতা সস্নেহ হাস্যে কন্যাকে অভিনন্দন করলেন। ছুটে এলেন উৎকণ্ঠিতা মাতা। উচ্ছ্বসিতা পদ্মা পতিগৃহের কথা কিছুই বলছে না, শতমুখে বলছে পিতৃগৃহের কথা। দুহিতার এ আচরণে দুঃখিতা হলেন জননী। বিচিত্র কালের গতি!

কিন্তু উল্লাসে মেতে উঠল পদ্মা। পূর্বপরিচিত সেই প্রাসাদ, সেই উদ্যান, সেই উদার উন্মুক্ত নীলাকাশ। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে। পিতৃগৃহের অবাধ স্বাধীনতার সঙ্গে পতিগৃহের বন্দিনী জীবনের তুলনা? থাক্ স্বাধীনতা, তবু সেখানে পদে পদে বাধা, কথায় কথায় বিচার। লোকনিন্দা, সমালোচনা। আর এখানে? মুক্ত চরণে ছুটে চলে গৃহ থেকে গৃহান্তরে,—নদীতীরে, বনে-উপবনে। এখানে গুণ্ঠন নেই, বাধা নেই, লোকলজ্জার ভয় নেই। নিঃসঙ্কোচ নিরঙ্কুশ জীবন। পিতৃগৃহের স্বচ্ছন্দ সুখ পতিগৃহে দুর্লভ।

আবার সেই উদ্দাম বিহারে নিজেকে ছেড়ে দিল বিলাসবতী পদ্মাবতী। আবার সেই নয়ন ভুলানো শৃঙ্গার বেশ। মুহূর্তে মুহূর্তে নব নব সজ্জা, নব নব অলঙ্কারে সে ভূষিতা হয়। সৈরিন্ধ্রী অগুরু-কুঙ্কুমকস্তূরীর অনুলেপন দিয়ে শেষ করতে পারে না। বিলাসিনীর বেশ ধারণ করে সে, সহস্রবার দর্পণে নিজের বেশভূষা দেখে। যৌবনভারে ঢল ঢল অঙ্গ। এত রূপবতী সে। প্রমুক্ত কেশপাশে মুখ যেন নীলজলে রক্তকমল, অধর যেন রক্তপদ্মে লাক্ষারাগ। নিজের অঙ্গপ্রাচুর্যে নিজেই শিউরে ওঠে গরবিনী।

দেহে জাগে সেই পূর্বচাপল্য। অপাঙ্গে খঞ্জন নৃত্য, চরণে নটিনী-গতি। বনহরিণীর মত বনে বনে ক্রীড়া করে সে। চঞ্চল নয়ন খুঁজে ফেরে,—কোথায় ক্রমিল, কোথায় গোভিল।

বনচারী নির্ণিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকে। অশঙ্ক, নিঃসঙ্কোচ পদ্মা। সে ভুলে যায়, সে গৃহবধূ। ভুলেও স্বামীর কথা ভাবে না। কুমারীর ভাবভঙ্গিতে কুমারীর মত নির্বাধ তার বিচরণ। জীবন যেন যথেচ্ছ স্বেচ্ছাচার।

শিউরে ওঠে সঙ্গিনীদল, শিউরে ওঠেন মাতা। বিদর্ভরাজ স্নেহের উত্তাপ দিয়ে নন্দিনীকে বলেন, 'কাল সুযামুন পর্বতে বিহারে যাবে পদ্মা।'

'সুযামুন পর্বত!' —সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চিতা হয় পদ্মাবতী। যৌবনের প্রথম অগ্নিস্পর্শ এই পর্বতেই লাভ করেছিল প্রগল্‌ভা।

অতি রমণীয় সুযামুন পর্বত। পর্বতকে প্রিয়ার মত বেষ্টন করে বয়ে চলেছে নীল যমুনাধারা। তীরে নয়নমোহন বন। শাল-তাল-তমালের ফাঁকে ফাঁকে অর্জুন, কোবিদার, দেবদারুর বীথি। মাঝে মাঝে অশোক বকুলের শ্রেণী।

বসন্ত এসেছে বনে। ঋতুমতী প্রকৃতি। অশোকের শাখায় রক্তস্তবক, বকুলের ডালে থরে থরে শুভ্রতা। পথিক বধূর মত বর্ণ-সৌরভ মেলে ধরেছে বন-কুসুম।

পর্বকালে উচ্ছ্বসিতা নদীজলের মত মত্তা হল যৌবনস্ফীতা পদ্মা। পুষ্পিতা বনপ্রকৃতি উন্মাদ করে তুলল তাকে। বনতলে প্রস্ফুটিত পুষ্পমঞ্জরী, হাসছে স্বর্ণবর্ণা মদনপর্ণী—মদন শর ছুটেছে যেন চারদিকে। কুতূহলী হরিণ-হরিণী, লীলারত চকাচকী। ডালে ডালে সুরপঞ্চমে কূজন করছে কোকিল, দ্রুম ছায়ায় ডাহুক-ডাহুকীর রুতরোল।

মদোদ্ধতা মাতঙ্গিনীর মত ফুলের বনে প্রবেশ করল পদ্মা। দেহে

যেন আগুন জ্বলে উঠেছে। শাখা নমিত করে, পল্লব ভেঙে, ফুল ছিঁড়ে, পাঁপড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ভূমিতে ছড়িয়ে দিল সে। কখনো ছুটল হরিণের দিকে, চকিত হরিণের শৃঙ্গ ধরে সজোরে ঝাঁকিয়ে দিল, কখনো বা ময়ূরীর পেখম ধরে টেনে তাকে বিব্রত করে তুলল। কি করবে, ভেবে পাচ্ছে না উন্মাদিনী। সুপ্ত বাসনালোকে দোলা লেগেছে, বুকের অতলে উতল কামনা তরঙ্গ। অনাদিনিত্যা মায়া প্রকৃতির সংস্পর্শে চিরকাল এমনি করেই জীবহৃদয়ে জাগে আদিতম জৈবপ্রবৃত্তি। সে প্রবৃত্তি শাসন মানে না, বন্ধন মানে না, নিয়ম মানে না।

সহসা পদ্মার দৃষ্টি পড়ল স্বচ্ছতোয়া তড়াগে। কহ্লার কনকোৎপলে সুশোভিত জল। অসংখ্য ষট্পদ তাদের ঘিরে গুঞ্জন করছে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল পদ্মা। মুহূর্তে বিহ্বলা হল সে, মুহূর্তে অদ্ভুত ভাবান্তর। পাগল আরও পাগল হয়ে উঠল। সে হাসতে লাগল, নাচতে লাগল, বেসুরে গান করতে লাগল।

বিস্মিত সখীদল।

মঞ্জুলেখা বলল, 'সখী, এ কি করছ ?'

উত্তর দিল না পদ্মাবতী। উত্তর দেবার মত অবস্থা নয় তার। সে হাসছে, গান করছে, দেহের রেখায় রেখায় কিন্নরী-লীলার ছন্দ।

ভয় পেয়ে উচ্চস্বরে বলল মঞ্জুলেখা, 'একি করছ তুমি!'

অনঙ্গসেনা বলল, 'তোমার কাঁচুলি বক্ষোভ্রংশ হয়েছে।'

কেউ বলল, 'বসন সম্বরণ কর। শিথিল তোমার নীবিবন্ধ।'

জ্ঞানহারা উন্মাদিনী পদ্মা। সে হাসে, নাচে, গান করে। কোন কথা শোনে না।

দেহে তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে বলে মঞ্জুলেখা, 'সখী, তুমি কুলবধূ। পাতবিচ্ছেদে এরূপ আচরণ নিন্দনীয়, গর্হিত।'

স্খলিত বচনে বলে পদ্মা, 'আজ নিন্দার আনন্দন।'

তখন সেই পার্বত্য পথে যাচ্ছিল দ্রুমিল। দানব দ্রুমিল আজ কুবেরের অনুচর। একদিন পদ্মাবতীর বাল্যসখী ছিল সে, যৌবনে রূপের ভিখারী। সে থমকে দাঁড়াল।

কে? পদ্মাবতী? বিদর্ভ রাজনন্দিনী? দ্রুমিল শুনেছিল পদ্মার বিবাহ হয়েছে। এখন সে মাথুরমণ্ডলের অধীশ্বর ধর্মধীর উগ্রসেনের সহধর্মিনী। সে এখানে কেন?

তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকাল দ্রুমিল। সেই পদ্মাবতী। যোষিৎকুলের রত্নস্বরূপা পদ্মা। রূপ যেন দ্বিগুণিত হয়েছে আজ। সুকুমারাঙ্গে আসন পেতেছে সুন্দর অনঙ্গ! এমন রত্নকে স্বেচ্ছাবিহারে বনে ছেড়ে দিয়েছেন উগ্রসেন। উগ্রসেন কি নপুংসক?

পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকে দ্রুমিল। দ্বিতীয়া রতি পদ্মা। রতি আজ রূপের পসরা মেলে ধরেছে। অংসস্খলিত দুকূল, অসম্বৃত বক্ষোবাস। কমলবনে ফুটন্ত কমলে চরণ রেখে গর্বোন্নত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে যেন রূপকমলিনী।

মুহূর্তে মোহিত হয় দ্রুমিল। সহসা পঞ্চায়ুধ নিয়ে পুষ্পধন্বা যেন আক্রমণ করেছে তাকে। তার কুঞ্চিত ভ্রুযুগ, উদ্যত পুষ্পশর। শাশ্বত দানব বুদ্ধিতে অস্থির হয়ে ওঠে দ্রুমিল। দানব সে, পরস্ব-লোলুপ, পরদার লোভী, এই-ই দানবের ধর্ম। কেন দানবধর্ম পালন করবে না সে?

তৃষাতুরের মত অগ্রসর হয় দ্রুমিল, উগ্রতা তার চরণে, উগ্রতা তার দৃষ্টিতে। কিন্তু পরমুহূর্তেই থমকে দাঁড়ায় সে। জ্ঞানিভাবে তার দানববুদ্ধিতে বিচরণ। পদ্মাবতী কল্যাণী কুলবধূ। দ্রুমিল তার ধর্ম নষ্ট করতে পারে না।

নিজের ওষ্ঠাধর দংশন করে দ্রুমিল। কামনায় অযত চিত্ত, জ্ঞানের বাধায় উন্মাদ হয়ে ওঠে। এমনি উন্মাদ সে হয়েছে অনেক দিন। যৌবনবতী পদ্মার রূপ তার রক্তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, দুরন্ত ক্ষুধার তাড়নায় সে অস্থির হয়েছে। তবু পদ্মাবতীকে সম্ভোগ

সতীত্বের বল? পতিব্রতা হয়ে পতিতার ধর্ম অবলম্বন করছ তুমি, কুলবধূ হয়ে কুলটার মত আচরণ করছ তুমি!'

ক্ষুব্ধা ক্রুদ্ধা মঞ্জুলেখা। ভ্রুক্ষেপহীন মদমত্তা পদ্মা। তার পা টলছে, স্বর কাঁপছে। স্মরগরলে আচ্ছন্ন হয়েছে সে। কোন উত্তরই সে করে না। শুধু মুগ্ধার মত হাসে। তারপর চঞ্চল চরণে অগ্রসর হয়।

মর্মরে, শিঞ্জনে কাঁপতে থাকে সুযামুন পর্বতের সমীরণ। নূপুর-ধ্বনি বাজতে বাজতে এসে স্তব্ধ হয় রক্তাশোকের ছায়ায়।

'একি! কে ও!'—অবাক হয়ে যায় পদ্মাবতী। শিলাতলে আসন করে একমনে ঝঙ্কার তুলছেন তারই স্বামী, স্বয়ং উগ্রসেন। এই বিজন পর্বতে কেমন করে তিনি এলেন! বিচারমূঢ়া স্মর-বিহ্বলা।

মুহূর্তে রক্ত হিম হয়ে যায় পদ্মার। চতুর মথুরাধীশ। পদ্মাকে পিতৃগৃহে পাঠিয়ে তার গতিবিধি লক্ষ্য করতে এসেছেন গোপনে। পদ্মাকে বনে নিঃশঙ্ক বিচরণ করতে দেখে কি বলবেন তিনি? পদ্মাই বা কি উত্তর দেবে?

লজ্জাহীনা লজ্জায় মরে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই শঙ্কিতা হয় সে। ইতিউতি পালাবার পথ খোঁজে পদ্মা।

কিন্তু পদ্মার ভয় অমূলক। প্রীতি গদগদস্বরে উগ্রসেনরূপী দ্রুমিল উগ্রসেনের স্বর অনুকরণ করে আহ্বান করল, 'এস, প্রিয়তমে, এস। আমাকে দেখে আশ্চর্য হচ্ছ? পদ্মাবতীর চিত্ত-ভ্রমর পদ্মাকে ছেড়ে কি জীবন ধারণ করতে পারে? তাই সকলের অলক্ষ্যে ছুটে এসেছি বনে। ওগো মধুমতি, আমায় কৃপা কর।'

আজ এই মুহূর্তে পদ্মার কাছে অমৃতের মত মনে হল এই মধুর আহ্বান। স্বামীর আবির্ভাব মহাপাপের হাত থেকে রক্ষা করেছে তাকে। ইনি যদি উগ্রসেন না হতেন, না জানি কি অঘটন ঘটত আজ।

তবু কাঁপছে পদ্মা। অজানা ভয়।

মধুর হেসে বলল ক্রুমিল, 'অয়ি ভীরু, দ্বিধা কেন? আমি তোমায় আহ্বান করছি। তোমার প্রিয়পতি তোমায় আহ্বান করছে।'

মুখ তুলে তাকাল পদ্মা। বিবাহের পর কোনদিন ভাল করে স্বামীর দিকে মুখ তুলে তাকায়নি সে। আজ এইক্ষণে তাকিয়ে দেখল। কি মদন-মোহন রূপ! কি অনিন্দ্যসুন্দর কান্তি! বলিষ্ঠ বীরদেহ, তেজোব্যঞ্জক দীপ্তি। দিব্যমাল্য, দিব্য অলঙ্কার সেই দীপ্তিকে আরও লাবণ্যময় করে তুলেছে। মোহন রাজবেশে মূর্তি ধরে এসেছেন তার প্রাণনাথ। তিনি শুধু সুন্দর নন, তিনি অন্তর্যামী। তিনি পদ্মার স্মরগরলখণ্ডন।

পুলক, লজ্জা, ভয়। মুখ আনত করে সলাজ বধূ।

দানব ক্রুমিল উঠে এসে তার হাত ধরে। আনন্দে আবেগে যেন সম্বিৎ হারিয়ে যায় পদ্মার। রক্তাশোক লালে লাল, লালে লাল সুযামুন পর্বতের অপরাহ্ন। বীণাঝঙ্কার যেন থেমে যায়নি, বীণা এখনও বাজছে। পদ্মার হৃদয় তন্ত্রীতে স্বর্গীয় মূর্ছনা।

পদ্মার বিবশ দেহকে নিবিড় বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করে একান্তে কুঞ্জের অন্তরালে চলে যায় ক্রুমিল।

কুঞ্জের আড়ালে থেকে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে মঞ্জুলেখা। সখী ধর্মচ্যুত হয়নি। স্বামীর কাছে ধরা দিয়েছে স্বেচ্ছাচারিণী!

দূরে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করে সে।

ক্ষণ-পরেই ক্রুদ্ধ গর্জন ওঠে কুঞ্জে, 'কে তুমি! একি, তুমি ক্রুমিল? কেন এই সর্বনাশ করলে আমার?'

প্রগল্ভের মত হাসে ক্রুমিল, 'আমি তোমায় রক্ষা করেছি। শৈশবের সঙ্গী তুমি, তোমায় আর্ত দেখে আর্তত্রাণ করেছি।'

'চুপ কর দুষ্ট! নিজে কামোন্মত্ত হয়ে দোষ দিচ্ছ নারীকে?'

'আমি কোন অন্যায় করিনি।'

'পতিব্রতার ধর্ম নষ্ট করেও বলছ, অন্যায় করিনি ?'

'পাতিব্রত্যের গর্ব করনা কামিনী ! তুমি পতিব্রতা নও।'

'কি বললে ?'—উত্তেজনায় ফেটে পড়ে পদ্মা।

সুতীব্র শ্লেষে বলে ক্রুমিল, 'তুমি পতিব্রতা নও।'

দীপ্তকণ্ঠে পদ্মা বলে, 'আমি পতিব্রতা, পতিকামা। তুমি পতিরূপ ধারণ করে আমার ধর্ম নষ্ট করেছ। পতিজ্ঞানেই আমি তোমায় বরণ করেছিলাম।'

সুগম্ভীর কণ্ঠে বলে ক্রুমিল, 'যে রমণী ভর্তৃশুশ্রূষা করে, প্রতিনিয়ত বাক্যে, মনে, কর্মে পতিকে ধ্যান করে, স্বামী ক্রুদ্ধ হলেও তাকে ত্যাগ করে না, সে-ই পতিব্রতা। পতিব্রতার ধ্যান-জ্ঞান পতি। যে এর বিপরীত আচরণ করে, সে পুংশ্চলী। পুংশ্চলীই পতিকে ত্যাগ করে যথেচ্ছ বিচরণ করে, স্বামীর অনুপস্থিতিতে লৌল্যবশে ভোগ ও শৃঙ্গার সেবা করে। সাধ্বী নারী পতিবিচ্ছেদে কাতর হয়, একবেণী ধারণ করে, দুঃখিতা হয়ে ভোগ-বিমুখী হয়। তুমি এর কোন্‌টা পালন করেছ ?'

ক্রুমিলের কথায় কাঁপতে থাকে পদ্মা। সে যেন ভাষা হারিয়ে ফেলে। বজ্রগম্ভীর স্বরে ক্রুমিল বলে, 'দুষ্টা তুমি, পাপ তোমার মনে। গার্হস্থ্যধর্ম পরিত্যাগ করে কেন তুমি এখানে এসেছ ? কোথায় তোমার পতিদৈবত্ব ? তুমি যদি পতিমতি, পতিকে ত্যাগ করেছ কেন ? তুমি যদি পতিকামা, পতির অনুপস্থিতিতে এই শৃঙ্গার বেশ ধারণ করেছ কেন ? কেন কুলবধূ হয়ে নিঃশঙ্কা প্রমত্তার মত এই গিরিকাননে বিচরণ করছ ?'

ক্রুমিলের বাক্য কঠিন বজ্র। বাগ্‌বজ্রে স্তম্ভিত পদ্মা। ক্রুমিল থামে না, সে বলে চলে, 'কুবেরানুচর দানব আমি। দানবের ধর্ম পর-স্বাপহরণ ও পরদার সেবন। এই-ই দানবের স্বভাব। কিন্তু বিধাতার নিয়মের রাজ্যে দানবও সৃষ্টিছাড়া নয়। পাপমতিকে উচিত শাস্তি দেবার জন্য বিধাতা দানব সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞানিভাবে আমরা দানব-বুদ্ধিতে বিচরণ করি। ধার্মিক যারা, পুণ্যাত্মা—পবিত্র যারা পতিব্রতা,

আমরা তাদের স্পর্শ করি না। কিন্তু পাপের ছিদ্র পেলে আমরা সর্বনাশ সাধন করি। পতি বর্তমানে স্বেচ্ছাচারিণী পুংশ্চলীর মত বিচরণ করে, তুমি নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে এনেছ, তোমার মানসিক ব্যভিচারের সমুচিত ফল পেয়েছ। হে দুর্বুদ্ধে, শোন, আমি তোমাতে অমোঘ দানবতেজ বিন্যস্ত করেছি, এ তেজে বিশ্বত্রাস সন্তান উৎপন্ন হবে। হে স্বাধীনা, সেই অধর্মচারী সন্তানের জননী হয়ে তোমার পাপের পরিণাম বহন কর।'

দেখতে দেখতে আঁকা-বাঁকা পার্বত্যপথে মিলিয়ে যায় মায়াধর দ্রুমিল। ভয়ে, দুঃখে ছিন্ন লতার মত কাঁপতে থাকে স্বেচ্ছাধীনা বিদর্ভনন্দিনী। কে যেন পাষাণভার চাপিয়ে দিয়েছে তার দেহে।

এগিয়ে আসে মঞ্জুলেখা,—বিষাদঘন মুখ।

রুদ্ধকণ্ঠে বলে পদ্মাবতী, 'আমার সর্বনাশ হয়েছে সখী!'

অশ্রুর ঝর্ণা নামে নয়নে, বিকলাঙ্গে ত্রাসের কম্পন।

গভীর দুঃখে বলে মঞ্জুলেখা, 'আমি সবই দেখেছি। সবই শুনেছি। প্রগল্‌ভ যৌবন, আর স্বেচ্ছাবিহারের এই ভয়ঙ্কর পরিণামের কথা ভেবেই আমি ভয় পেয়েছিলাম। কর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। চল, গৃহে ফিরে যাই।

সখী-অঙ্গে ভর করে দুঃখিতা পদ্মাবতী গৃহে ফিরে এল। মন্থর গতি, মন্থর দেহ। লজ্জায় মরে যাচ্ছে সে। এ পাপের ভার সে কেমন করে বহন করবে? প্রকাশ হলে কি বলবে লোকে? বুকে তীব্র অনুশোচনার উচ্ছ্বাস। কেঁদেও কুল পায় না কুলবতী।

শুনে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন রাজমহিষী। দ্রুত ছুটে এলেন স্বামীর কাছে। অনুযোগের সুরে তীব্র ভাষায় বললেন, 'এইবার অবাধ স্ত্রী-স্বাধীনতার ফল ভোগ কর।'

বিদর্ভরাজ বললেন, 'কেন, কি হয়েছে?'

একে একে সকল ঘটনা বিবৃত করলেন পদ্মাবতীর জননী।

শুনে দুঃখিত হলেন ধীর সত্যকেতু। এ দোষ তাঁরই। শৈশব থেকে অতি মাত্রায় প্রশ্রয় দিয়ে তিনিই নন্দিনীকে নিঃশঙ্কা করে তুলেছেন। রুদ্ধ নির্ঝরের উৎস মুখ তিনিই অবারিত করে দিয়েছেন। কন্যাকে স্বাধীন-বিহারে পাঠিয়েছেন বনে, পর্বতে, তড়াগে। কিশোরী যৌবনে পদার্পণ করলেও তাকে নিষেধ করেননি, স্নেহের উত্তাপে স্বেচ্ছাচারকে বর্ধিত করেছেন। শুধু তাই নয়, স্নেহান্ধ হয়ে বিবাহের পরেও কন্যাকে পতিগৃহ থেকে নির্বন্ধ করে আনয়ন করে পূর্বপরিচিত পুরুষ-কুটুম্বের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার সুযোগ করে দিয়েছেন।

সত্যকেতু ঠিক ভাবতে পারেন নি, জোয়ারের স্রোতস্বিনী কূল ভাঙ্গতে পারে,—যৌবন প্রগল্ভ হয়ে বিশ্বাসভঙ্গ করতে পারে।

ধীমান সত্যকেতু বিপদে ধৈর্যহারা হলেন না। মনে ক্ষুব্ধ গর্জন, কিন্তু বাইরে অবিচল। অপ্রকাশ্য দুঃখ। অবিলম্বে তিনি কন্যার দোষ আচ্ছাদন করার ব্যবস্থা করলেন।

পরদিন সজ্জিত হল যান-বাহন, শিবিকা, বহুমূল্য সজ্জার আড়ম্বরে সজ্জিত হল চতুর্দোলা। ভারে ভারে প্রস্তুত হল স্বর্ণ যৌতুক, ঐশ্বর্যের উপঢৌকন। কন্যাকে মহার্ঘ রত্নে ও বেশভূষায় সজ্জিত করে, উপঢৌকনসহ বিদর্ভরাজ সালঙ্কারা দুহিতাকে পতিগৃহে প্রেরণ করলেন। ঐশ্বর্য ত্রুটির আচ্ছাদন, আড়ম্বর হল পাপের আবরণ।

উগ্রসেনকে লিখন পাঠালেন চতুর বিদর্ভরাজ,—'কন্যার নিকট জামাতার গুণের কথা শুনে তিনি প্রীত হয়েছেন। প্রীতিমান্ জামাতা প্রীতিস্নেহের পরিচয় দিয়ে শুধু মর্যাদা রক্ষা করেননি, বিদর্ভরাজকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সূত্রে বদ্ধ করেছেন। শ্রদ্ধার প্রতিদান স্নেহ। তাই তিনি কন্যাকে যথোচিত মর্যাদায় পতিগৃহে প্রেরণ করছেন। বিবাহের কন্যা পিতার নয়, পতির ধন। পতি যেন নিজের বস্তু নিজে গ্রহণ করে রাজাকে ভারমুক্ত করেন।'

চাতুরী করে দুহিতার দোষ ঢেকে দিলেন সুচতুর পিতা। সাম ও দান নীতিতে পারদর্শী বিদর্ভরাজ।

আহ্লাদে ডগমগ উগ্রসেন। পরম সমাদরে তিনি প্রিয়াকে গ্রহণ করলেন। হৃদয়ে দীর্ঘ বিরহের পুঞ্জিত আবেগ, মুক্তনির্ঝরের মত কলমুখর ভাষা।

রাত্রির ভোগ-প্রহরে কক্ষে রত্নদীপের আলো, রত্ন পালঙ্কের দীপ্তিতে উজ্জ্বলতর কক্ষ। সম্মুখে সজ্জিতা সুন্দরী বধূ, ঝলমল অলঙ্কার।

হর্ষ গদগদস্বরে প্রিয়াকে সম্ভাষণ করলেন উগ্রসেন, 'পদ্মা!'

নববধূর মত আবেগ বিহ্বল নেত্রে তাকাল পদ্মা। আজ যেন এই প্রথম মুখচন্দ্রিকা।

উগ্রসেন বললেন, 'তোমার বিরহে মুহূর্ত আমার কাছে যুগ মনে হয়েছে। বিরহে যত দুঃখ দিয়েছ, প্রিয়ার মুখ দেখে আজ সব ভুলে যাচ্ছি। পদ্মা তুমি মৃতপ্রায় জীবনের অমৃত!'

পদ্মা কথা বলতে পারে না। তার বুকেও অনেক আবেগ, অনেক উচ্ছ্বাস। অনেক ঘা খেয়ে বক্রা আজ সরলা। আজ অভিমান নেই, শুধু আত্মসমর্পণের আবেগ। আশ্রয় পেলে বেঁচে যায় পদ্মা, সঙ্কোচে সে নয়ন নত করে। বুক কাঁপে।

এগিয়ে আসেন উগ্রসেন। স্বরালাপে মধুর স্বরালাপ, 'পদ্মা, আমার পদ্মিনী!' স্বামীর প্রীতিবাক্যে দুই চোখ বেয়ে অশ্রু নামে পদ্মার। স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে অঝোর ধারায় কাঁদতে থাকে সে। এ কান্না আনন্দের নয়, এ কান্না দুঃখের। এই স্বামীকে সে অবজ্ঞা করেছে, এই প্রীতিমান্ স্বামীকে সে দুঃখ দিয়েছে। অকূল সাগরে নির্ভরযোগ্য আশ্রয় পেয়ে আশ্রয়হীনা যেমন তার ওপর নিঃশেষে নিজেকে সমর্পণ করে, তেমনি উগ্রসেনের বুকে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করে পদ্মা। আজ স্বামীই তার একাশ্রয় লজ্জাহরণ।

মধুর মিলনে দিনগুলি মধুর হয়ে ওঠে। উগ্রসেন বিস্মিত হয়ে যান। এত প্রেম পদ্মার! কোথায় সেই বক্রভাব, কোথায় সেই দুর্জয় ক্রোধ? প্রগল্‌ভা আজ প্রেমে বিগলিতা। উগ্রসেনকে মুহূর্তমাত্র না দেখলে সে অস্থির হয়ে ওঠে, কেঁদে অনর্থ বাধায়। যার প্রেমের জন্য একদিন কত সাধ্য-সাধনা, কত স্তুতি—আজ সে স্বেচ্ছায় প্রেম নিবেদন করে, হৃদয়ের অর্ঘ্য সাজিয়ে দেয় নিঃশেষে। উগ্রসেনময়ী পদ্মা, পদ্মাময় উগ্রসেন। দুইজন যেন এক দেহ, এক প্রাণ, এক আত্মা।

মধুর দিন, মধুরা রাত্রি, মিলন বাসরে কল্পলোকের মধুর স্বপ্ন। দূর গগনে কাঁপে নীহারিকা, কক্ষে কাঁপে স্বর্ণদীপ,—আর সোনার পালঙ্কে কাঁপে পদ্মিনী পদ্মা। সুখের মাঝেও শঙ্কিত স্বপ্ন। কে আসে! অন্ধকারে তার দেহকে আচ্ছন্ন করে, গতিকে মন্থর করে, কে আসে! বিশ্বত্রাস ক্ষেত্রজ সন্তান?

ভয়ে শিউরে উঠে পদ্মা। আরো গভীরভাবে স্বামীকে নিবিড় করে বুকে জড়িয়ে ধরে সে।

ক্রমে দৌহৃদ-লক্ষণ প্রকাশ পায়। খুসী হয়ে ওঠেন উগ্রসেন। দ্বিতীয় আত্মা সন্তান, পিতৃপ্রদীপের আর এক শিখা। কল্যাণী পত্নীকে দীপাধার করে এই প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন পতি। বংশপরম্পরায় এই গার্হপত্য অগ্নি অনির্বাণ থাকে, গৃহমেধ পূর্ণাঙ্গ হয় এই অগ্নিতে। সার্থক সেই গৃহী, যিনি পুত্রবান্; সার্থক সেই গৃহপত্নী, যিনি পুত্রবতী। গৃহকল্যাণে এমনি করে প্রবাহিত হয় জীবনের ধারা। অমর জীবন-প্রবাহ।

আহ্লাদে আহ্বান করেন উগ্রসেন, 'কল্যাণী পদ্মাবতি! সুমঙ্গলী বধূ আমার!' শিউরে উঠে পদ্মা। সে কি সত্যি কল্যাণী? সে কি সত্যি সুমঙ্গলী বধূ?—পুংশ্চলী হয়ে সে পতিব্রতার অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, কামিনী হয়ে সে কল্যাণীর বিশেষণ চুরি করে নিচ্ছে। সংশয় নেই পতির

মনে। পতি সরল, উদার, ধর্মধীর। কিন্তু পদ্মা নিষ্কলঙ্ক কুলকে, সরলতাকে কি উপহার দিচ্ছে সে?—সঙ্কর সন্তান।

অস্থির হয়ে ওঠে পদ্মা। তার মনে হয়, সহস্র বৃশ্চিক-দংশন জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে তার দেহে, প্রচণ্ড তাড়িত প্রবাহে অবশ হয়ে যাচ্ছে সে। চিন্তায় অসহ হয়ে ওঠে দিন, দুঃস্বপ্নে ভরে ওঠে রাত্রি। দানবের ভ্রূকুটি, দৈত্যের আস্ফালন, হিংস্রের উন্মত্ততা—তার চারপাশে উল্লাস, বিদ্রূপ, অট্টহাস।

সংস্কার ভাঙ্গো, স্বাধীন হও—বলে যতই হুঙ্কার করুক মানুষ, চিরাগত সংস্কারকে খুব সহজে ভাঙ্গতে পারে না। রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত যুগ-সঞ্চিত সংস্কার। বিদ্রোহী মন তাকে চূর্ণ করতে চায়, নূতন যুগকে জাগিয়ে তুলতে চায়। চূর্ণও করে। কিন্তু সেই চূর্ণিত সংস্কারস্তূপে আবার রক্তবীজের মত জেগে ওঠে সনাতন সংস্কার, নীতির অঙ্কুর। তখন প্রেতের মত আক্রমণ করে সে। অতিবড় স্বেচ্ছাচারীও সে আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারে না। বুদ্ধির বিপর্যয় ঘটে, বোধে আগুন লাগে। সুতীব্র আত্মপীড়নে মানুষ তখন অস্থির হয়।

এমনি অস্থিরতায় উন্মাদ হয়ে ওঠে পদ্মা। স্বেচ্ছাচারের বিষবীজ নাশ করার জন্য পাগলের মত নিভৃতে দাসীকে ডেকে সে বলে, 'আমায় এমন ঔষধ এনে দিতে পারিস্, যাতে মাতৃত্বের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায় আমার!'

বিমূঢ়ার মত দাসী দাঁড়িয়ে থাকে। চিৎকার করে বলে পদ্মা, 'আমায় ঔষধ এনে দে! ঔষধ এনে দে!'

উন্মাদিনী পদ্মা। দেহের গুরুভারে মন্থর দেহ, মাথায় যেন পর্বত ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু চঞ্চল প্রতিটি রক্তকণা! ক্ষিপ্ত প্রেতের মত তার দেহে নৃত্য করছে বিষাক্ত শোণিত। তার বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে, তাকে উন্মাদ করে তুলছে। প্রেতের শাসনে অস্থির পদ্মা। সে ভেবে পায় না, কি করবে। গভীর রাতে পদচারণা করে সে।

জেগে ওঠেন উগ্রসেন। স্তিমিত প্রদীপের আলোয় দেখেন। কে ও! শয্যা থেকে লাফিয়ে সামনে আসেন তিনি, 'একি! পদ্মা!'

পদ্মাবতীর দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, কেশ বিপর্যস্ত, বসন অসম্বৃত। দারুণ উত্তেজনায় কাঁপছে সর্বাঙ্গ, টলছে পা।

উগ্রসেন তাকে জড়িয়ে ধরেন।

উন্মাদের মত ভগ্নস্বরে চিৎকার করে ওঠে পদ্মা, 'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও!'

কঁকিয়ে উঠছে কণ্ঠ, মুহুর্মুহু বেঁকে যাচ্ছে দেহ, নীল হয়ে ফুলে ফুলে উঠছে দেহের শিরা।

উগ্রসেন সভয়ে ডাকেন, 'পদ্মা!'

পরমুহূর্তেই কি যেন ভেবে ডুকরে কেঁদে ওঠে পদ্মাবতী। প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে মুক্ত করে উগ্রসেনের পা জড়িয়ে ধরে, 'আমায় মুক্তি দাও, মুক্তি দাও। এ সন্তান আমি চাই না।'

স্বামীর পায়ে হর্ম্যতলে মাথা কুটতে থাকে পদ্মা। রক্তাল দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে কাঁপতে থাকেন অমিতপ্রভ ধর্মধীর উগ্রসেন।

কম্পিতকণ্ঠে তিনি বলেন, 'সন্তান কুলপ্রদীপ, সন্তান মাতাপিতার নয়নানন্দ।'

অঙ্কুশ-তাড়িতা করিণীর মত চিৎকার করে ওঠে পদ্মা, 'সন্তান বিশ্বত্রাস, সন্তান বিভীষিকা।'

দুঃখিত হন উগ্রসেন। তিনি ভেবে পান না, যার সম্ভাবনায় আনন্দে অধীর হয়ে ওঠে প্রত্যেক জননী, নারীত্বের স্বপ্নসাধ সার্থক হয় যে কুমার-সম্ভবে, তাকে পেয়েও পদ্মা এমন করছে কেন? হয়তো এ আসন্ন সম্ভবার শঙ্কা। মৃত্যুর আনীল বিভীষণ মূর্তিকে স্পর্শ করতে করতে নবজাতককে জন্ম দেন জননী, সুতীব্র যন্ত্রণা। সে যন্ত্রণা পরিণামে আনন্দদায়ক হলেও জন্মমুহূর্তে দুর্বহ তার পীড়ন।

প্রীতিমান উগ্রসেন পত্নীকে সান্ত্বনা দেন। সযত্নে তাকে উঠিয়ে ধীরে ধীরে শয্যায় শয়ন করিয়ে দেন। স্নেহস্পর্শে কিছুক্ষণের মধ্যে

ঘুমিয়ে পড়ে পদ্মা। কিন্তু এ ঘুম শান্তির ঘুম নয়, অতি অশান্তির। তন্দ্রায় দারুণ তুঃস্বপ্ন। সেই তুঃস্বপ্নে চম্‌কে চম্‌কে ওঠে নিরঙ্কুশ বিলাসিনী। কে যেন আসছে, ভ্রূকুটি-কুটিল তার নয়ন, নিদারুণ তার গর্জন। ভয়ঙ্কর অস্বস্তিতে হাত-পা ছুড়তে থাকে পদ্মা।

সেদিন রাত্রে ঝড় উঠল। প্রলয় রজনীতে প্রলয় অন্ধকার। ভয়াল কৃষ্ণ মেঘে আচ্ছন্ন গগন। মুহুর্মুহু অশনি গর্জন করতে লাগল। উনপঞ্চাশ বায়ুর তাণ্ডব শুরু হল। শিলাবৃষ্টিতে অস্থির মেদিনী, বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ হৃদয়। পদ্মার বুকে প্রলয়ের কালাগ্নি শিখা। তার তুই চক্ষু রক্তবর্ণ, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি—যেন এক সঙ্গে রক্তবৃষ্টি আর অগ্নিবৃষ্টি শুরু হয়েছে তার চারিদিকে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উন্মাদ প্রেতের মত নৃত্য করছে। উল্লাসে এগিয়ে আসছে দানবসঙ্ঘ। মত্ত পবনে, প্রলয় ঝটিকায় আজ তাদের মহোৎসব।

কাঁপছে পদ্মা। ঘূর্ণিপাকে ঘুরছে সৃষ্টি। সে আসছে, সে আসছে! কৃষ্ণ ভয়ঙ্কর তার মূর্তি, গর্জমুখর তার কণ্ঠ। তাকে ঘিরে শুরু হয়েছে দানবের জন্ম-মহোৎসব। আতঙ্কে চোখ বোজে পদ্মা।

সেইরাত্রে একটি শিশুপুত্র প্রসব করল বিদর্ভ-নন্দিনী পদ্মাবতী। এই শিশুই অতি ভীষণ, বিশ্বত্রাস কংস,—স্বেচ্ছাচারিণী যুবতীর নিরঙ্কুশ বৃত্তির বিষময় ফল।

॥ সাধারণী ॥

ত্রিবক্রা কুব্জাকে কে না জানে ?—সেই কুব্জা, মথুরার অনুলেপনোপজীবিনী। রাজা কংসের অনুলেপন সংগ্রহ করে সে। লেপন-নৈপুণ্যে সে অদ্বিতীয়া।

কুব্জাকে অসাধারণ সুন্দরী বলা চলত, যদি একটি ত্রুটি তার না থাকত। সুন্দর তার অঙ্গবর্ণ, যেন কাঁচা সোনা। ভাসা ভাসা তার চোখ—আকর্ণ বিস্তৃত। বঙ্কিম নয়নে বঙ্কিম কটাক্ষ। যৌবনও ফুরিয়ে যায়নি তার। কিন্তু দোষ,—সে কুঁজো, ত্রিবক্রা। সেই অঙ্গবিকৃতি তার সমস্ত সৌন্দর্যকে নষ্ট করে দিয়েছে।

নারীত্বের কামনা সফল হয়নি কুব্জার। হৃদয়ে কামনার ঝড়, আশার উত্তাল তরঙ্গ। অঙ্গে দিব্য আভরণ ধারণ করে পথিকবধূর মত সে কলহাস্যে কতদিন কত পথিককে আকর্ষণ করেছে, কিন্তু কেউ তার দিকে ফিরে তাকায়নি। অবাঞ্ছিতা কুব্জা, ব্যর্থ তার সঙ্গকামনা।

হৃদয়ের ক্ষোভ কুব্জাকে চটুলা করে তুলেছে, আর কর্কশ ! চপলা মদোদ্ধতা কুব্জা, অত্যন্ত মুখরা। বিলেপন দ্রব্য হস্তে সে রাজপথ পরিক্রমা করে। কোন পথিককে সে আকর্ষণ করতে পারে না, কিন্তু মুখরা নিশ্চুপ হয় না তবু। তার গর্ব, সে রাজা কংসের সৈরিন্ধ্রী। এই কথাই সে সগর্বে প্রচার করে। রাজভবনে তার কত সমাদর, সে

কথা কি জানে কেউ? স্বয়ং কংস তার অনুলেপন ব্যবহার করেন। কুব্জার গাঢ় অনুলেপন গায়ে মেখে খুসী হন মথুরার রাজা।

কেউ তাকে না চায়, না চাক। কুব্জা গ্রাহ্য করে না। স্বার্থ ছাড়া সে আর কিছু চায় না। স্বার্থ আর আত্মসুখ—তার কাছে তাদের বড় কিছু নেই। বিলেপন দ্রব্যের জন্য মানী লোককেও তার দ্বারে প্রার্থী হতে হয়। সে সেই সুযোগ নেয়। প্রচুর অর্থের বিনিময়ে সে পণ্য ছাড়ে। রূপের গরব না থাক, রূপার গরব তার যথেষ্ট। মথুরা মণ্ডলের লেপন-সামগ্রীর ভাণ্ডাগারিক কুব্জা। ব্যর্থ তার পণ্যাঙ্গনাব জীবন। কিন্তু সার্থক স্বার্থান্বেষী লেপনোপজীবিনীর জীবন। এই তার আত্মপ্রসাদ।

সেই কুব্জা, কি হল তার? মথুরায় আজ পদার্পণ করছেন এক নতুন আগন্তুক। বয়সে নবীন কিশোর, পৌগণ্ড সীমার অপরূপ মধুর মূর্তি। কুব্জা তার দিকে চেয়ে চোখ ফেরাতে পারছে না। মরি, মরি, কি মাধুর্য! সুনীল অঙ্গবরণ, সুনীল দীপ্তি। নীলার বন্যা যেন বয়ে যাচ্ছে কুব্জার নয়নে। সুপ্ত কামনা-সাগরে এ কোন্ নতুন দোল।

হস্তে বিলেপন দ্রব্যের স্বর্ণ থালা নিয়ে রাজা কংসের ভবনে চলেছিল কুব্জা। কুঁজো হয়ে চলছিল ত্রিবক্রা। সহসা পথে এই রূপের বন্যা। সবাই মুগ্ধ। পথে পথে মুগ্ধ জনতার ভিড়। একটু উঁচু হয়ে দেখে কুব্জা, পথের পাশে অসংখ্য বাতায়ন খুলে গিয়েছে। কোটি কোটি উৎসুক দৃষ্টি পিপাসিতের মত নবীন কিশোরের রূপসুধা পান করছে। কেউ বলছে, দেখ, দেখ—এই সেই কৃষ্ণ, গোপীর প্রাণধন।

কৃষ্ণ! কৃষ্ণের কথা শুনেছে কুব্জা, শুনেছে তার রূপ-গুণের কাহিনী। কৃষ্ণ ভুবন-সুন্দর, কিন্তু সে কৃষ্ণ যে এমন, এত তার রূপমাধুরী—কুব্জা কল্পনা করতে পারে নি। চিত্ত চমৎকারী অসমানোর্দ্ধ রূপ, রূপচ্ছটায় মোহিত বিশ্বভুবন। এ রূপ দেখে মধু মাতাল ভ্রমরের মত চোখ বিভোল হয়, ইন্দ্রিয় অবশ হয়ে আসে।

মুগ্ধা কুব্জা, আপন ভোলা কুব্জা। কাজের কথা ভুলে যায় সে। অনুলেপনের স্বর্ণথালা হাতে চিত্রার্পিতের মত সে দাঁড়িয়ে থাকে।

অন্তরে বাসনার তরঙ্গ, চোখে স্বপ্নের আবিষ্টতা। থালায় ভরা মৃগমদ অনুলেপন, ঠিক ওই নীলকান্তের মত কান্তি। এ বুঝি ওই দেহেরই যোগ্য। কুব্জা ভাবে, যদি এই লেপন দ্রব্যে সে লিপ্ত করতে পারত ওই শ্যাম অঙ্গ, লাক্ষারাগে রঞ্জিত করতে পারত ওই পক্ব বিম্বাধর।

কল্পনায় অঙ্গ-স্পর্শের কথা ভেবে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে ত্রিবক্রা। দেহ স্বেদধারায় ভেসে যায়।

পরমুহূর্তেই চমকে ওঠে সে। কি সে ভাবছে? এ বিলেপন রাজার। এই কস্তুরি, এই কুঙ্কুম, এই লোধ্ররেণু, পদ্ম পরাগ, এই গোরোচনা ও শ্বেতচন্দন—রাজার ভোগ্য। কোথাকার কোন্ অজানা পথিক, শুনেছে—ব্রজের রাখাল, তার অঙ্গে এই রাজভোগ্য অনুলেপন? রাখালের রাজ-ভাগ্য?

ত্রিবক্রা কুব্জার মুখে কুটিল হাসি ফুটে ওঠে, যে হাসি ফুটে ওঠে শ্রীমানের মুখে শ্রীহীনকে দেখে, যে হাসি ফুটে ওঠে ধনী শ্রেষ্ঠীর মুখে নিঃসম্বল ক্রেতাকে দেখে। বিনাপণে রাজভোগ্য অনুলেপন সে রাখালকে দেবে কেন? সঙ্কল্পে অটল হয় কুব্জা। বঙ্কিম গতিতে রাজভবনের দিকে চলতে থাকে সে। বেলা হয়ে আসছে, রাজার স্নান-কাল উত্তীর্ণ প্রায়। বিলম্বে ক্রুদ্ধ হতে পারেন কংস।

কিন্তু পথ চলতে পারে না সে। রাজভবনের পথ ভুলে যায়। ঘুরে ফিরে আসে সেই পথে, যে পথের ধুলি-কণায় সেই নওল কিশোরের কোমল চরণের চিহ্ন। অবাক চোখে চেয়ে থাকে কুব্জা। পথের ধুলায় ফুটেছে কি স্থলকমল!

মধুর স্বপ্নে বিভোর হয় সে। মনে হয় জনবহুল রাজপথ যেন জনশূন্য। সে পথে আর কেউ নেই, আছে শুধু কুব্জা, আর শ্যামসুন্দর। সুশ্যাম অঙ্গে অভিরূপতার প্লাবন।

সহসা তার সামনে বেণুরবে ঝঙ্কৃত হয় মধুর কণ্ঠ, 'কে তুমি!' মধু যেন ঝরে নীলাকাশ থেকে, মধু যেন ঝরে উজ্জ্বল সূর্যকিরণ থেকে। মৃদু সমীরণের বুকে মধুর মূর্ছনা।

মুগ্ধার মত মুখ উঁচু করে তাকায় কুব্জা। সম্বিৎ যেন ফিরে আসে, ফিরে আসে স্বার্থান্বেষীর অহং বোধ। চটুল কণ্ঠে সে উত্তর করে, 'রাজভবনের সৈরিন্ধ্রী আমি, নাম আমার কুব্জা।'

—তোমার হাতে কি সামগ্রী ?

—বিলেপন দ্রব্য—অগুরু, কুঙ্কুম, কস্তুরি।

—এ অঙ্গ-অনুলেপন কার ?

—রাজার। আমি রাজা কংসের দাসী। তাঁরই অঙ্গে আমি নিত্য এই অনুলেপন মাখিয়ে দিই।

—ওগো সুন্দরি, এ অনুলেপন তুমি আজ আমার অঙ্গে মাখিয়ে দাও।

অন্তরের গোপন কামনা কি ভাষা পেয়েছে এই নবাগত সুন্দরের মুখে, না এ কোন ছলনা ? বিস্মিতা হয়ে ভাবে কুব্জা, কেউ তো তাকে সুন্দরী বলে না ? সকলেই তাকে উপহাস করে বলে কুব্জা, ত্রিবক্রা, কুটিলা। এ তাকে সুন্দরী বলছে কেন ? এ কি লোভীর স্তুতি ? তাকে কথায় ভুলিয়ে বিনাপণে লেপনে লোভ করছে কি কোন চতুর লোভাতুর ?

আত্মস্থ হয় কুব্জা। স্বার্থবুদ্ধি জেগে ওঠে। কুটিল পসারিনীর মত সে বলে, 'পণ ছাড়া আমি কাউকে অনুলেপন দিই না। অনুলেপন তুমি নিতে পার, উপযুক্ত পণ দিয়ে।'

'কি তোমার পণ ?' মধুর কণ্ঠে বলেন নওল কিশোর। তার মুখে ভুবনভুলানো হাসি, নয়নে মধুর কটাক্ষ।

আবার আত্মসম্বিৎ হারিয়ে ফেলে কুব্জা। এই কোমল মাধুর্য, এই লাবণ্য, এই স্মিত হাসি, এই মধুর কটাক্ষ—কুটিলা কুব্জাকে স্বার্থের জগৎ থেকে যেন কোন্ এক আনন্দলোকে নিয়ে যায়। সেখানে শুধু দিয়েই সুখ। সেখানে পসার উজাড় করে দেয় পসারিনী, পণ্য উজাড় করে দেয় পণ্যাঙ্গনা। তাইতো, কি পণ কুব্জার ? কি তার দাবি ?

পণের কথা ভুলেই যায় সে। নবীন পাথকের অঙ্গস্পর্শের লোভ তাকে উন্মাদ করে তোলে। বিভোলার মত সে স্বর্ণথালা থেকে লেপন

দ্রব্য তুলে নিয়ে পরম যত্নে সেই বাঞ্ছিত অঙ্গে গাঢ় লেপন মাখিয়ে দেয়, রাজঅঙ্গের বিলেপন—চন্দন, কস্তুরি, গোরোচনা, পদ্মপরাগ।

স্বার্থলুব্ধা পণ্যলোভীর একি বিভ্রম! অনুলেপন মাখাতে মাখাতে শিউরে ওঠে কুব্জা, অধরে লাক্ষারাগ লাগিয়ে দিতে গিয়ে সে রোমাঞ্চিত হয়। নবীন নাগরের চিবুকখানি ধরে কুটিলা ত্রিবক্রা নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকে সেই মোহন মাধুর্যের পানে। স্তব্ধ ভাষা, চোখ দুটি ছলছল। কি সুমধুর রূপ!

'সুন্দরি!'

লজ্জায় আরক্ত হয়ে ওঠে কুব্জা। একি শ্লেষ? শ্লেষ হলেও মধুঝরানো বক্রোক্তি। গদগদ কণ্ঠে হেসে বলে সে, 'সুন্দরী আমি নই, আমি ত্রিবক্রা। আমাকে কেউ সুন্দরী বলে না, বলে কুটিলা। আদর করেও কেউ কাছে ডাকে না, ঘৃণা ভরে দূরে সরে যায়।'

কুব্জার দুচোখ ছাপিয়ে এবার জল নামে। অভিমানের স্বরে সে বলে, 'ওগো সুন্দর, আমাকে কেন সুন্দরী বলছ তুমি! কুরূপাকে রূপসী বলে কেন দুঃখ দিচ্ছ?'

'সত্যিই যে তুমি সুন্দরী,' হেসে বলেন মদনমোহন, 'রাকা চন্দ্রের মত তোমার অঙ্গ লাবণ্য, পদ্মের মত সুন্দর নয়ন। নিটোল এই যৌবন পথিকের নয়নানন্দ, প্রবাসীর আশ্রয়। কে বলে তুমি অসুন্দরী?'

কথায় যেন মধু ঝরে। অশ্রু গদগদ কণ্ঠে কুব্জা বলে, কিন্তু আমি যে কুব্জা, বিকৃত কদাকার আমার অঙ্গ।'

'এই দুঃখ!' হেসে বললেন নওল কিশোর। তারপর এগিয়ে এসে পরম সোহাগে নিজের চরণ দিয়ে কুব্জার চরণ চেপে ধরলেন, অতি আদরে এক হাতে কুব্জার গলদেশ বেষ্টন করে অপর হাতে তার চিবুক-খানি তুলে ধরলেন।

কথা বলতে পারছে না কুব্জা। একে অঙ্গস্পর্শের সুখ, তার ওপর আচমকা এই ঘটনা। কিছু বলার আগেই কৃষ্ণ কুব্জার চরণ পা দিয়ে চেপে চিবুকে জোরে চাপ দিলেন। জোরে চাপ দিতেই কুব্জার অসমান

অঙ্গ সমান হয়ে গেল। দেখতে দেখতে ত্রিবক্রার বক্রদেহ যৌবন-সুলভ দৃঢ়তায় ঋজু হয়ে উঠল।

আশ্চর্য হয়ে গেল কুব্জা। সর্বাঙ্গে জেগেছে যেন যৌবনের জোয়ার, শুষ্ক নদীতে অকাল প্লাবন! যৌবন-শ্রীতে জেগে উঠেছে কোন্ সে অরতি—ঋজু দেহ, উন্নত বক্ষ, বিশাল নিতম্ব, অবিরাম গ্রীবাভঙ্গি। সে কি সেই কুব্জা?

সে নয়। সে কুব্জা নয়, ত্রিবক্রা নয়—সে অতনু-প্রিয়ার রূপধন্যা এক নবীনা তন্বঙ্গী। অটুট যৌবন নিয়ে জন্ম নিয়েছেন যেন নর-কন্যা উর্বশী—স্বর্গ বিলাসিনী অপ্সরী।

বিভোল নয়নে সে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে থাকে। মধুর হেসে কুব্জাকে ছেড়ে দেন কৃষ্ণ।

বহুদিনের সুপ্ত আকাঙ্খা প্রগল্ভ হয়ে ওঠে। নারী হয়েও নারীত্ব সার্থক হয়নি কুব্জার। বুকের অতলে লালসার উতল ঢেউ। সেই ঢেউ কোন পুরুষের দেহতটকে প্লাবিত করেনি। কুরূপা বক্রা আকর্ষণ করতে পারেনি কাউকে। চেয়ে চেয়ে না পেয়ে থিতিয়ে গিয়েছিল চাওয়ার দাবি, আত্মসুখের কামনা সুপ্ত হয়ে ছিল হৃদয় গুহায়। সে যে কুব্জা, কুটিলা। কে তাকে গ্রহণ করবে? কেউ করেনি। তাই মনে মুখে কর্কশ হয়ে উঠেছিল প্রত্যাখ্যাতা অভিমানিনী নারী।

কিন্তু আজ! সে সমানাঙ্গী বরাঙ্গনা। দেহে রূপের প্রগল্ভ নৃত্য, মনে বাসনার উদ্দাম বীচিভঙ্গ। নিজেকে সংবরণ করতে পারে না প্রমত্তা প্রমদা। আবেগভরে কৃষ্ণের বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করে সে।

'আবার কি প্রার্থনা?'—ফিরে প্রশ্ন করেন নাগর কৃষ্ণ, 'অনুলেপনের বিনিময়ে পণ কি পাওনি তুমি?'

রতি-বিদগ্ধা কুব্জা এতদিন মরে ছিল, আজ আবার জেগে উঠল সুপ্ত তীক্ষ্ণ বাগ্ বৈদগ্ধ্য, 'পণে কি আশা মেটে কোন পণ্যাঙ্গনার? তাদের যে অনেক আশা।'

'আর কি আশা, বল?'—হেসে প্রশ্ন করেন কৃষ্ণ।

কুব্জা বলে, 'ওগো সুন্দর, সৌন্দর্যের সৌভাগ্য দিয়ে আমায় ধন্য করেছ, এবার সে সৌন্দর্য সফল কর।'

বিলোল কটাক্ষ, মুখে চপল হাসি, কুব্জা বলতে থাকে, 'নিজের সুখের জন্যই সাজাব বাসকসজ্জা, প্রতীক্ষায় জাগব বাসর রজনী—হে বীর নাগর, আমায় নিরাশ কর না।'

—'আত্মসুখের জন্য তুমি আমায় কামানা কর?'

—'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছাই সাধারণীর কাম্য।'

—'কিন্তু, সে তো খুব তুচ্ছ।'

—'হোক তুচ্ছ। হে কামদ, সেই পণ দিয়েই তুমি আমাকে কৃতার্থ কর।'

ক্ষণেকের জন্য কি যেন ভাবেন শ্যামসুন্দর। মুহূর্তের দ্বিধা, মুহূর্তেই স্থির সংকল্প। সহাস্যে মধুর কণ্ঠে তিনি বলেন, 'যে আমাকে যেভাবে কামনা করে, হে সুন্দরী, আমি সেই ভাবেই তার কামনা পূর্ণ করি। তোমার কামনা যদি একনিষ্ঠ হয়, নিশ্চয় তুমি আমাকে পাবে। হোক আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা,—আমাকে কামনা করে সে ইচ্ছা যদি গাঢ় হয়, একান্ত হয়, আমি তা পূর্ণ করব। কাজ শেষ হয়ে গেলে আমি আসব, নিশ্চয় আসব।'

পথের ধূলিতে পদচিহ্ন রেখে সম্মুখ পথে অদৃশ্য হয়ে যান নওল কিশোর। কৃষ্ণের মধুর উন্মাদক রূপের ছবি হৃদয়ে গেঁথে আশায় বুক বেঁধে নিজের গৃহে ফিরে আসে সমাঙ্গা কুব্জা। আজ তার নবজন্ম। অস্বাদিত সুখ, অনির্বচনীয় এ তৃপ্তি।

হৃদয়ে সকাম প্রণয়। সেই প্রণয়ের রঙে রাঙা কুব্জা। অজানা পুলকের বাণে পরিপূরিত সুদীর্ঘ, সরল দেহ। নবীন নাগর কৃষ্ণ তার গৃহে আসবে, আসবে কুব্জার নবজাগ্রত যৌবনকে ধন্য করতে। এ আনন্দকে লুকিয়ে রাখতে পারে না কুব্জা। নতুন উৎসাহে নিজ গৃহকে সে সজ্জিত করে। ঐশ্বর্য তার কম নয়।

স্বার্থপরায়ণা বিলেপনোপজীবিনী। জীবনে অনেক অর্থ সে

উপার্জন করেছে। রাজা কংসের বৃত্তি তো আছেই, তার ওপর বিলেপন পসারিনীর নিজস্ব আয়। যক্ষিনীর মত সে ধন সঞ্চয় করেছে। ব্যয় তার ছিল না, ব্যয় সে করেও নি। ব্যয় করার সুযোগও আসেনি কোনদিন।

আজ সেই ধনে হাত দিল কুব্জা। নবনিযুক্ত দাস দাসীর কোলাহলে গৃহ পূর্ণ হয়ে উঠল। কুব্জা নির্দেশ দিল, ভোগবতীর মত এই পুরীকে সজ্জিত করতে হবে।

মুহূর্তে হাজার কর্মীর সাড়া পড়ে গেল কুব্জার গৃহে।

দেখতে দেখতে তার আবাস মণিময় ভূষায় ভূষিত হল। গৃহতোরণ ভূষিত হল অপূর্ব সজ্জায়। স্থপতি ও শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় সামান্য তোরণ বিজয়তোরণে পরিণত হল। তোরণস্তম্ভে রতি-বিলাসের বিচিত্র চিত্র, কোথাও বিলাসিনীর নৃত্য, কোথাও বা নাগকন্যার বিহার-লীলা। তোরণ শীর্ষে কামোদ্দীপক মকর ধ্বজা। গন্ধর্বলোক প্রমূর্ত হল কুব্জার গৃহ-দ্বারে।

গৃহের সজ্জা আরও বিস্ময়কর, ভোগোপকরণে ভূষিত দ্বিতীয় ভোগবতী। প্রাচীরগাত্রে চিত্রিত মদন-রতির বিবিধ চিত্র। বসন্ত-সখা যেন বসন্তের রক্তিম চিহ্ন বিস্তার করেছে কুব্জার গৃহে। মণিময় দীপদানিতে ঘৃত প্রদীপ, গন্ধ ধূপের সৌরভে আর পদ্মরেণুর গন্ধে আমোদিত কক্ষ। মধ্যে রত্নখচিত গজদন্তের ভোগ-পালঙ্ক। কোথাও মাল্য আর বিলেপন দ্রব্যে পূর্ণ থালা, যেন মদনের পূজোপহার। কর্পূর তাম্বুলে পূর্ণ তাম্বুলকরঙ্ক, মধুপর্ক ও আসবে পূর্ণ পানপত্র। দিব্য ভোগাগারে পরিপূর্ণ ভোগের সকল আয়োজন।

পূর্ণ যৌবনা সুন্দরী কুব্জার দেহ আজ শুধু অঙ্গলাবণ্যে নয়, সুমনোহর অঙ্গসজ্জায় পরিভূষিত, যেন রতির রতি-সজ্জা। রক্তাম্বরে বেষ্টিত কান্তিময় তনু—প্রদীপ্ত রাগের রজঃছটা। কাঞ্চীদামে শোভিত বিশাল নিতম্ব, কটিতে সুবর্ণ মেখলা। আ-নাভি লম্বিত রত্নময় কণ্ঠহার—নাম তার সপ্তকী, প্রত্যঙ্গে শোভিত দিব্য ভূষণ। অঙ্গে অঙ্গে বিচিত্র

আলেপন, বক্ষে মৃগমদ, নয়নে কৃষ্ণাঞ্জন, কপালে চন্দন-রোচনার পত্রলেখা।

মুকুরে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে নিজেই মোহিতা মোহিনী কুব্জা। এত তার রূপ! নিটোল যৌবনে অটল সৌন্দর্য। কামনার সাগরে ভাসে নবীনা রূপকুমারী। তার চারদিকে আশার সহস্র তরঙ্গ-ভঙ্গ, অন্তরে অনঙ্গের বিচিত্র রঙ্গ।

সন্ধ্যা না হতেই বাসর সাজায় বাসকসজ্জিকা। ব্যাকুল প্রতীক্ষা। ব্যাকুলতর মৌন জিজ্ঞাসা, কখন তিনি আসবেন, কখন?

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যায়। কই, এলেন না তো তিনি? তিনি আসবেন তো? অধীরা, চপলা কুব্জা। আপন বেশভূষার প্রতি সানুরাগে তাকিয়ে দেখে রাগময়ী। এ রূপের আকর্ষণ কি কম? কুব্জা আজ বিশ্ববিজয়িনী। তাঁকে আসতেই হবে। গভীর আত্মবিশ্বাসে গ্রীবাভঙ্গি করে দাঁড়ায় কুব্জা।

কৃষ্ণ আসেন না। প্রথম রাত্রি কেটে যায়। ব্যর্থ হয় প্রতীক্ষা। কামনায় অস্থির হয়ে ওঠে কুব্জা। ক্ষোভে সে ওষ্ঠাধর দংশন করে। অসহ্য যেন ব্যর্থতা। কুটিলার বক্র কুটিল মান। অঙ্গ থেকে আভরণ খুলে রাখে কুব্জা।

কিন্তু স্বস্তি নেই। দিনের আলোয় গবাক্ষ ধরে দাঁড়ায় সে। মথুরায় এসে কোন বিপদ হয়নি তো তাঁর?

মল্লরঙ্গে বিপুল জয়ধ্বনি ওঠে। দুরুদুরু কেঁপে ওঠে কুব্জার বুক। কৃষ্ণের কোন অমঙ্গল হল না তো?

দাসী এসে সংবাদ জানায়, মল্লভূমিতে দুর্ধর্ষ চানূরকে নিহত করেছেন কৃষ্ণ। গর্বে কুব্জার বুক ভরে ওঠে। কুব্জা লক্ষ্য করেছে, নওলকিশোর কৃষ্ণ, কিন্তু মুখে বীরত্বের গূঢ়চিহ্ন—যেন বজ্রগর্ভ শাঁওন মেঘ। অমন অদ্ভুত বীর্যকে পরাভূত করবে কে? কৃষ্ণ নিজেই ভুবন-মঙ্গল, অমঙ্গলও তাঁর হতে পারে না।

সহসা রাজা কংসের আগার করুণ ক্রন্দনে পূর্ণ হয়ে ওঠে। আবার

ভয় হয় কুব্জার। মদোদ্ধত বীর কংস, আর কৃষ্ণ কোমলাঙ্গ কিশোর। কিন্তু পরক্ষণেই উল্লাসে নেচে ওঠে কুব্জার অন্তর। ত্বরিতে সংবাদ আসে, কংস নিহত হয়েছেন, বিজয়ী হয়েছেন তরুণ মদন। মদোদ্ধতকে হেলায় জয় করেছেন মদন-মোহন। এবার তাহলে তিনি আসবেন। বিজয়ী বীরের বেশে তার দুয়ারে আসবেন তার দয়িত। তটস্থা কুব্জা।

সন্ধ্যাগমে আবার নতুন আশায় বেশভূষায় সজ্জিতা হয় সে। রাত্রি আসে, ক্রমে রাত্রি গভীর হয়। স্মর-উন্মাদনায় উন্মাদ হয়ে ওঠে কুব্জা। কৃষ্ণ আসেন না। অভিমান উদ্বেল হয়। কুব্জা শুনেছে, অতি শঠ, অতি চতুর কৃষ্ণ। তাঁর চাতুরীর অন্ত নেই। তাহলে কি তিনি স্তোকবাক্যে ভুলিয়েছেন কামার্তা পণ্যাঙ্গনাকে? আজ মথুরা-রাজ কৃষ্ণ। কত রমণী তাঁর কৃপা-ভিখারিণী। হয়তো তাদের সঙ্গসুখে তিনি কুব্জাকে ভুলে গিয়েছেন। রমণী-মোহন কৃষ্ণ, বহুবল্লভ। একে তৃপ্তি নেই, ব্রজে ষোড়শ সহস্র গোপীর মনোরঞ্জন করেন তিনি। ব্রজবধূ বীট হয়তো আজ অন্য কোন রমণীর বাহুপাশে ধরা দিয়েছেন। মথুরামণ্ডলে নাগরীর তো অভাব নেই।

হৃদয়ে গর্জিত অভিমান। অভিমানে নিজের মনেই গর্জন করে মানিনী কুব্জা। কুটিল নয়নে কুটিল ভ্রূভঙ্গ, যেন উদ্যত কামান। ঈর্ষায় জ্বলে অভিমানিনীর চোখ। নিজের অজ্ঞাতসারেই কাকে উদ্দেশ্য করে যেন তর্জনী তোলে সে।

কিন্তু পর মুহূর্তেই স্তিমিত উত্তেজনা, নয়নপল্লবে নিরাশার কম্পন, চোখের তারায় চঞ্চলতা। রাত্রির প্রতীক্ষা নীরব ও গভীর। বহুবিস্তৃত চিন্তার জাল। সংশয়, শঙ্কা, প্রশ্ন। স্নেহধারায় সিক্ত অভিমান। কেন তিনি এলেন না? কুব্জার প্রতি ঘৃণা? কিন্তু করুণ-কান্ত কৃষ্ণ, অপাত্রেও তাঁর করুণা। অন্ধকারে কি নীলকুমুদ ফোটে না, ফোটে না কি নীল তারা? কবে কুব্জার অঙ্গ শীতল হবে তাঁর স্পর্শে, কবে ধন্যা হবে কুব্জা কৃষ্ণ অঙ্গের ছোঁয়ায়?

কামতপ্তা, কামদগ্ধা কুব্জা। সে ভাবে, কামের প্রগল্ভ আবেদন শুনে

কি কৃষ্ণ তাঁকে ত্যাগ করেছেন? আত্মসুখের জন্য—সকামা হয়ে কৃষ্ণকে প্রার্থনা করেছে সে। এই তার দোষ? কামনা কে না করে? ব্রজ রমণীরাও সকামা হয়ে তাঁকে চেয়েছে। তাদের আশা সফলও হয়েছে। লোকে বলে, ব্রজগোপীর কামনা কাম নয়, প্রেম। কি তফাৎ কামে ও প্রেমে? প্রেম কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা, কাম আত্মেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি। তুচ্ছ কি এই নিজ ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি? মিথ্যা কি আত্মেন্দ্রিয়ের তুষ্টি? জগতের কোন্ কামিনী নিজ ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি কামনা না করে? কে জোর করে বলতে পারে দয়িতের আলিঙ্গনে সে নিজে সুখ পায় নি? প্রিয়ের তুষ্টি কি নিজের সুখ নয়?

কুব্জা সাধারণী। সে ঠিক বুঝতে পারে না, কামে ও প্রেমে পার্থক্য কোথায়? পণ্ডিতেরা কোথায় সূক্ষ্ম ভেদ-রেখাটি টানেন। সে শুধু বোঝে, মর্ত্য কামনাবান। কামনার আবেদন ফুলে-ফুলে, প্রজাপতির পাখায় পাখায়। কুব্জার মনমরা সেই কামনা। কুব্জা স্বীয় সুখই চায়। কৃষ্ণকে সে সম্ভোগের জন্যই কামনা করে। কুব্জার ভোগ-দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেই কামনার সুর।

পাগল হয়ে ওঠে কুব্জা। মনে মনে কৃষ্ণের আশ্লেষ কল্পনা করে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে কামুকী, অধরস্পর্শের কল্পনায় বিবশা হয় কুটিলা। প্রতিটি অঙ্গ যেন কৃষ্ণের প্রতি অঙ্গের জন্য উন্মুখ। কৃষ্ণ চিন্তায় তন্ময় কুব্জা। আত্মসুখের জন্যই তার কৃষ্ণকামনা।

সেদিনও কুব্জা প্রতীক্ষামন্দিরে বসে আছে। সেদিনও আশায় দিন গুনছে সে। দিন গুনে গুনে ভুল হয়ে যায়। কতদিন হল? প্রায় দু-মাস। চতুঃষষ্ঠি দিন বিগত হয়ে গেল। আর কবে তিনি আসবেন?

'কাজ শেষ হলেই তোমার গৃহে আসব'—বলেছিলেন শ্যামসুন্দর। এখনও কি কাজ শেষ হল না? কত কাজ জীবনে? কত রাকা রজনী, কত কুহু-যামিনী কেটে গেল। আজ চাঁদিনী রাত, মাধবী জ্যোৎস্না। আজ কি তিনি আসবেন?

হয়তো আসতে পারেন। একদিন জ্যোৎস্নাভরা রাতেই তিনি

ব্রজরমণীর মনোরঞ্জন করেছিলেন। সেদিন সুপ্রভাত গোপী-জীবনে। সন্ধ্যার গগনে শশধর, প্রস্ফুটিত মল্লিকাকুসুম। চন্দ্র অরুণরাগের চুম্বন এঁকে দিয়েছিল শ্বেত মল্লিকার শুভ্র অধরে, সমীরণ সোহাগ-পরশ বুলিয়ে দিচ্ছিল নব পল্লবে! নন্দিত সন্ধ্যাগমে মধুর বংশীধ্বনি করলেন কৃষ্ণ। ভুবন-ভুলানো কামগীতি। পাগলের মত ছুটে এল গোপরমণী, বিস্রস্ত কুন্তলজাল, অসম্বৃত বেশবাস।

কুব্জার মন চলে যায় বৃন্দাবনের বেণুবনে। কৃষ্ণ-চিন্তায় বিভোর কুব্জা। কল্পনা-নয়নে সে দেখে কৃষ্ণের ভুবন-মোহন কান্তি। কি অনুপম রূপ? কে বলে তিনি কালো? আলোর আলো কৃষ্ণ। নয়নের দৃষ্টিসুখ কৃষ্ণ, অন্তরের তৃপ্তি-সুখ কৃষ্ণ। তাঁর জন্য যেন অনন্তকাল ধরে প্রতীক্ষা করছে কুব্জা, অনন্তকাল ধরে ছুটে চলেছে তার মন।

ভাবতে ভাল লাগে কুব্জার। বড় মধুর এই কল্পনার জাগ্রত স্বপন। ভাবের মিলনে যদি এত সুখ, প্রত্যক্ষ মিলনে না জানি কত পুলক? শ্রুতি ভরে উঠবে কুব্জার, আবেশে আঁখি বুজে আসবে তার।

কুব্জা কি করবে তখন? অভিমানে সরে দাঁড়াবে? অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নেবে? কোন প্রিয় সম্ভাষণ করবে না তাঁকে?

তা কি হয়? অভিমান কি থাকে তাঁর কাছে? নিজের মনেই হাসে কুব্জা, পণ্যাঙ্গনার আবার মান? নিজের লোভের জন্য যার যাচ্ঞা, আত্মসুখের জন্য যার কামনা—মান তার জন্য নয়। কোন পথিকবধূ চিরকাল কোন পথিককে বেঁধে রাখতে পারে না। পথিক চিরচঞ্চল। পথ তাকে ডাকে। একস্থানে স্থির হয়ে থাকার তার উপায় নেই। পথিকের স্থিতি ক্ষণিকের, প্রেমও ক্ষণিকের। তাই পথিকবধূকে সকল আয়োজন ক্ষণমিলনের জন্যই প্রস্তুত রাখতে হয়। একমুহূর্তও বৃথা অপব্যয় করার অবসর নেই তার। রাতের প্রেমিক প্রভাতে পথিক। এই পথিকের সঙ্গে এক রাতের জন্য নীড় বাঁধে পথিক-বধূ। সেখানে মান-অভিমানের সুযোগ কোথায়?

কুব্জাও কৃষ্ণকে কামনা করছে পথিক-বধূরূপেই। অভিমান সে করবে কখন? সে তো জানে পথিকের ব্যবহার। শ্রান্ত পথিক এসেই দেহ লুটিয়ে দেয় ভোগ-পালঙ্কে, এসেই পণ্যাঙ্গনাকে আহ্বান করে শয্যায়। কোন প্রেমালাপ নয়, রহস্য কথা নয়—একেবারে রতি-সঙ্কেত।

শিউরে ওঠে কুব্জা? কৃষ্ণের সেই সম্ভোগ-সঙ্কেতে কেমন করে সাড়া দেবে সে? কাজের শেষে শ্রান্ত হয়ে তিনি আসবেন, হয়তো এসেই ভোগ-পালঙ্ক আশ্রয় করবেন তিনি। কথা বলারও সুযোগ পাওয়া যাবে না। এসেই কুব্জাকে শয্যায় আহ্বান করবেন। নীরবে এগিয়ে যেতে হবে কুব্জাকে। কোন দ্বিধা নয়, লজ্জা নয়, নববধূর প্রথম আহ্বানে শঙ্কাতুর নববধূর সঙ্কোচ নয়। পথিক-বধূ চির প্রৌঢ়া, যেন সনাতন কাল থেকেই পুরাতনী পত্নী।

তবু হয়তো কান্তের প্রথম আহ্বানে কেঁপে উঠবে প্রথম সঙ্গমভীরু কুব্জার বুক। সজ্জিতা প্রৌঢ়া নায়িকার বুকে জাগবে লজ্জিতার সঙ্কোচ। রুনুঝুনু কেঁপে উঠবে শিঞ্জিত নূপুর, কিনিকিনি বেজে উঠবে হাতের কঙ্কন। সসজ্জ বধূর সলজ্জ সম্মতি আভাষিত হবে নূপুর-নিক্কণে, কিঙ্কিনী-ঝঙ্কারে আর ঈষৎ হাসিতে। মধুর হেসে কান্ত কৃষ্ণ তাকে বুকে টেনে নেবেন। প্রণয়ভীরু কুব্জা, নবসঙ্গমের লজ্জায় সশঙ্ক কুব্জা তবু বাধা দিতে পারবে না।

স্পর্শসুখে চোখ বুজে আসে কুব্জার। মনে হয় শীতল হল অনঙ্গতপ্ত অধর, বক্ষ, দেহ—ধন্য হল জীবন। তারই পীবর বক্ষে তারই দেওয়া গাঢ় অনুলেপনের মত আশ্লিষ্ট আনন্দমূর্তি কান্ত মাধব।

রাতের দ্বিতীয় প্রহরে রাজপথে প্রহরান্তিক ঘোষণা বাজে। চমকে ওঠে তন্ময় কুব্জা। কোথায় তিনি? কোথায় তার সাধের স্বপন? এ যে শূন্য মন্দির, শূন্য শয্যা। উজ্জ্বল প্রদীপালোকে মণিময় থালায় বৃথাই পড়ে রয়েছে মূল্যবান অনুলেপন—অগুরু, কুঙ্কুম, লোধ্ররেণু।

গুমরে কেঁদে ওঠে কুব্জা, কেঁদে ওঠে সমগ্র অন্তরাত্মা। পঞ্চশরে

জর্জর কামার্তা কামিনী, অসহায়ের মত আকুলভাবে বলে, 'এস, কৃষ্ণ, এস!'

সহসা বহির্দ্বারে কোলাহল শোনা যায়। ঊর্ধ্বশ্বাসে দাসী ছুটে আসে, ঝড়ের বেগে বলে, 'তিনি এসেছেন, তিনি এসেছেন।' কুব্জা যেন শুনতে পারছে না, কুব্জা যেন বুঝতে পারছে না কিছু। আনন্দের ঝড় উঠেছে হৃদয় কুঞ্জে। মনে ধাঁধাঁ, বিকল ইন্দ্রিয় গ্রাম। বিমূঢ়ের মত ছুটতে থাকে কুব্জা। হঠাৎ সে দেখে দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে তারই বহু প্রতীক্ষার ধন কান্তমূর্তি কৃষ্ণ, মূর্তিমান মদন। কুব্জার চোখে ঝলমল আলোর বন্যা।

মধুর হেসে কৃষ্ণ বলেন, 'সুন্দরি, আমি এসেছি।'

আনন্দে ভাষা হারা, আবেগে আকুল কুব্জা। সমস্ত দেহে বিপুল রোমাঞ্চ, প্রচণ্ড স্বেদধারা। মূর্ছিতের মত কৃষ্ণের চরণতলে লুটিয়ে পড়ে কামার্তা কুব্জা।

মথুরা মণ্ডলের সামান্যা বিলেপনোপজীবিনী সাধারণী নারী সে।